CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

Maqam: Center for Sufi Heritage

7/15, Aziz Mahalla, Block F, Joint Quarter, Mohammadpur, Dhaka-1207

চট্টগ্রামের সুফি-সমাজে বিদ্যমান তরিকাসমূহ: ইতিহাস ও বর্তমান

মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম[1]

ভূমিকা: বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, প্রচার-প্রসারে এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুফি-সমাজ। স্বভাবতই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে সুফি-সমাজের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি থাকার কথা। কিন্তু উনিশ শতকে আরবের আবদুল ওয়াহাব নজদির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, ঔপনিবেশিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় সুফিধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ বাংলার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপরীত মতাদর্শের অনুসারী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও, এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে সুফি-সমাজের অনুসারী, সমর্থক ও প্রভাবই সর্বাধিক। এর মধ্যে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলেই সুফি-সমাজের উপস্থিতি, কার্যক্রম ও প্রভাব সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রামের যে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য তার মূল কারণ চট্টগ্রামের সুফি-সমাজ। দরবার, দরগাহ, মাজার, খানকাহ, লঙ্গরখানা— সবমিলিয়ে চট্টগ্রামের সুফি-সমাজ এখনো পর্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছেন। যে কারণে পুরো বাংলাদেশের সুফি-সমাজের উপর চট্টগ্রামের সুফি-সমাজের প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এই প্রভাব ও প্রাধান্যের উৎস অনুসন্ধানের জন্য সর্বপ্রথম যে দরজাটি উন্মুক্ত করা জরুরী তা হলো, সিলসিলা ও তরিকার সুলুকসন্ধান। সুফি-সমাজের মাঝে একটি বিষয়ে সকলেই একমত, পারস্পরিক সাধনার পথ ভিন্ন হলেও মঞ্জিল অভিন্ন— রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়া। যে কারণে বহু সিলসিলা ও তরিকা থাকলেও কোনো না কোনো বাঁকে মেলবন্ধন তৈরি হয়। সুফি-সমাজের ঐতিহাসিক তত্ত্বতালাশ করতে এই বাঁকগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই লিখিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধ। চট্টগ্রামে আগত বিভিন্ন সিলসিলা ও তরিকার ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সে-সকল তরিকার বর্তমান কার্যক্রম তুলে ধরাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস ও বর্তমান কার্যক্রমের পাশাপাশি তুলনামূলক চিত্রও হাজির করা হয়েছে। বিভিন্ন তরিকার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালনা করা চট্টগ্রামের সুফি-সমাজ কীভাবে ধর্মীয়, মানবিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে অবদান রাখছেন তা বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসকে সামনে রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান আমলনামা; তত্ত্বতালাশ করতে গিয়ে উঠে এসেছে চলমান বাস্তবতাও।

কি-ওয়ার্ড: সুফি-সমাজ, তরিকা, সিলসিলা, সুফি-প্রভাব, দরবার, চট্টগ্রাম, বাইয়াত, খেলাফত, মুরিদ।

[1]**রিসার্চ এসোসিয়েট, মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ**

প্রথম অধ্যায়: সুফি-তরিকা (Sufi order)

১.১. তরিকা কী ও কেন?

তরিকা শব্দটি উদ্ভূত আরবি 'طريق (ত্বারিক)' থেকে। বাংলায় ব্যবহৃত হয় পথ বা রাস্তা অর্থে। পরিভাষায়, তরিকা বলতে বুঝায়, ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন এবং পরম সত্য (হাকিকত) সন্ধানের লক্ষ্যে সুফি-সাধক কর্তৃক প্রবর্তিত সাধনপদ্ধতি। এই সাধন প্রণালীর সিলসিলায় পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা এবং রাসুলুল্লাহ (দ.) ও তাঁর আহলের আনুগত্যই মুখ্য।[2]

সৃষ্টির সূচনালগ্নেই খোদা তা'লা সর্বপ্রথম আদি মানব আদম (আ.)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে ফুঁ দিয়ে আত্মা (রূহ) তৈরি করেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই মানবাত্মার ধর্ম হলো পরমাত্মার দিকে ধাবিত হওয়া এবং পরম সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হওয়া। অন্যদিকে শয়তানের প্ররোচনায় কুপ্রবৃত্তি (নফস) মানবাত্মার এই যাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বিপথগামি করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। তাই খোদার জমিনে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের প্রধান কাজ হলো, কুপ্রবৃত্তি (নফস) ও নিজ ইচ্ছাশক্তির উপর আত্মা (রুহ) এর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা এবং পরম সত্যের সন্ধানে যাত্রা অব্যাহত রাখা। আত্মা বা রুহের এই বিকাশ সাধনে সহায়তা করেন তরিকতের ইমাম, সুফি-সাধক, পীর, মাশায়েখেরা। সুফি-সাধকগণ হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাঁদের পথ আলোকিত। নবীজীর ওফাতের পর খলিফাগণ ও সুফিগণ আধ্যাত্মিক সাধনা শিক্ষা দিয়েছেন, যার ধারা এখনো অব্যাহত।

সুফিরা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করেন কুরআন ও হাদীস থেকে।[3] কুরআন ও হাদীসের আদেশ-নিষেধ, নিয়মনীতি ও পথনির্দেশনার উপর ভিত্তি করেই একজন মুসলমানের জীবনকর্ম নির্ধারিত হয়। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের এই জীবনপদ্ধতিকে বোঝানো হয় "শরিয়ত (شريعة)" পরিভাষায়।[4] সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য শরীয়তের বিধানসমূহ পালন করা অপরিহার্য। তাসাউফ (Sufism) বা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও প্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো শরিয়ত।[5] শরিয়তের বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ পালনের পর একজন সাধক আত্মশুদ্ধি লাভ করে। এই আত্মোপলব্ধি সাধককে পরমাত্মার নৈকট্য অর্জনের ও তাঁর গুণে গুণান্বিত হবার এবং পরম সত্যের উন্মোচন ঘটানোর জরুরত অনুভব করায়। ফলে এই পর্যায়ে সাধক আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের নিমিত্তে যথার্থ গুণসম্পন্ন একজন মুর্শিদ/শায়খ/পীরের শরণাপন্ন হন। সাধক মুর্শিদের উপদেশ মেনে নিয়েই আধ্যাত্মিক অগ্রগতি লাভ করে। পরমাত্মার নৈকট্য লাভের এই যাত্রায় একজন সাধকের জন্য মুর্শিদের শরণাপন্ন হওয়া ও তরিকায় দাখিল হওয়া অত্যাবশ্যক। সোহরাওয়ার্দী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী বলেন, "Without the murshid, no murid can advance, his advance is in proportion to his faith (in the murshid)"।[6] সাধকের এই পর্যায়ের জীবনপদ্ধতিকে বলা হয় তরিকত (طريقة)।[7] উল্লেখ্য যে, শরিয়ত ও তরিকত ভিন্ন ভিন্ন কোনো সাধনপ্রণালী নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনে তা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও অভিন্ন।

---

[2] Sheikh shahabuddin suhrawardi, A dervish textbook from the 'Awariful-Ma'rifa, Translated Persian into English by Lieut. Col, H. Wilberforce-Clarke, the octagon press, London, 1990, p.1-4.

[3] ডঃ মো. বদিউর রহমান, মুসলিম দর্শনের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৮

[4] ডঃ মনির-উদ্দীন ইউসুফ, বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, ঢাকা, আগস্ট ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৬৯

[5] ডঃ মো. বদিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২০

[6] Sheikh shahabuddin suhrawardi, Ibid, p.10.

[7] Ibid, p-58

শরিয়তের অনুরূপ তরিকতের সূচনাও ইসলাম ধর্মের সূচনালগ্ন থেকেই।[৪] তবে নবীযুগের পর, পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুফি-সাধককে কেন্দ্র করে এর বিকাশ ঘটে। "আধ্যাত্মিক সাধনাবলে প্রেমময় সত্তা, পরম প্রভুর নৈকট্য লাভ" লক্ষ্যকে এক ও অভিন্ন রেখেই নানা তরিকার উদ্ভব হয়। যাত্রাপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবার মঞ্জিলে মকসুদ কিন্তু এক। সকল তরিকার সুফি-সাধক অকপটেই স্বীকার করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তাঁদের মূল পাথেয়। তাই প্রত্যেক তরিকার শাজরার শীর্ষে তাঁর নাম। তিনি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। তিনি হযরত আবু বকর, উমর, আলী, সালমান ফারসী, আবু জর গিফারী, আবু হোরায়রা, আবু আইয়ুব আনসারী, মিকদাদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির, মাআ'জ (রা.) সহ বিশেষ কিছু সাহাবীদের এই তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দিয়েছেন।

[৪]ডঃ আব্দুল করিম, বাংলাদেশের সুফি সম্প্রদায় ও তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২৯

১.২. তরিকা বা সিলসিলার উদ্ভব

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুফিবাদের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং শরিয়তই এর মূলভিত্তি। রাসুলুল্লাহ (দ.) এর হাত ধরেই তরিকতের সূচনা। কালপ্রবাহে এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভব ঘটে নানা তরিকার। বিভিন্ন দেশ-জাতির সুফি-সাধকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের লক্ষ্যে নানা তরিকার প্রকাশ ঘটে। সুফি-সাধকেরা আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন রাসুলুল্লাহ (দ.) থেকে। দ্বিতীয় ধাপে হযরত আলী (রা.) ও আবু বকর (রা.) থেকে এবং তৃতীয় ধাপে হযরত হাসান আল বসরী (রা.) থেকে।[9] প্রকৃতপক্ষে হাসান বসরীর সূত্র থেকেই 'কাদেরিয়া', 'চিশতিয়া', 'সোহরাওয়ার্দিয়া' নামক প্রধান তিনটি তরিকার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ও তার সাহাবীদের পর ইমাম হাসান বসরীর হাত ধরেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার সূচনা হয়েছে বিধায় তাঁকে ইসলামী জগতের প্রথম সুফি সাধক বলা হয়।[10] পরবর্তী সময়ে হাসান বসরীর দুই শিষ্য: খাজা আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ (মৃ: ১৭৭ হিজরী/ ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'জায়েদিয়া' নামক মূল তরিকার অধীনে চারটি শাখা ও হাবিব ইবনে মুহাম্মাদ আল-আজমী (ইন্তেকাল ১২০ হিজরী/ ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'হাবিবিয়া' নামক মূল তরিকার অধীনে আটটি শাখার সমন্বয়ে সর্বমোট চৌদ্দটি তরিকা বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।[11]

সুফি-তরিকাসমূহের শাজরা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিস্তামিয়া, বখতাসিয়া, নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় দ্বিতীয় নাম হযরত আবু বকর (রা.)-এর।[12] এছাড়া অন্যান্য সকল তরিকায় হযরত আলী (রা.) কে তরিকার প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি রাসুলুল্লাহর সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তরসূরী।[13] এর দরুন অধিকাংশ তরিকার অনুসারীরা রাসুলুল্লাহ (দ.) এর পর হযরত আলীকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অতীতের সুফি-সাধকের সাহিত্য ও সংগীত থেকে শুরু করে হাল জামানার গ্রাম বাংলার তরিকার অনুসারীদের মুখে মুখে যা এখনো ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। হযরত আলীর মাধ্যমে যে-সকল তরিকা বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রবাহিত হয়েছে, তার সবকটিতেই তৃতীয় পুরুষ হিসেবে পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান অথবা ইমাম হোসাইনের সংযুক্তি বিদ্যমান। অন্যদিকে যেসব তরিকা আবু বকর সিদ্দিক'র মাধ্যমে এসেছিল, তার সবকটিতে হযরত সালমান ফারসীর সংযুক্তি বিদ্যমান।

'চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ' গ্রন্থে ডঃ শেহাবুল হুদার বর্ণনা অনুসারে, নবীযুগ ও সাহাবীযুগের পরবর্তী সময়কালে ইসলামে মরমী আন্দোলন (আধ্যাত্মিক বা সুফিবাদী ধারা) বিকশিত হয় তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে[14]:-

প্রথম পর্যায় (অর্থাৎ নবম শতাব্দী পর্যন্ত) নীরব আধ্যাত্মিক সাধনার। এই সময়কালে যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুফি ধ্যান ধারণার প্রচার প্রসার ঘটে, তাঁরা হলেন:- ইমাম হাসান বসরি (ইন্তেকাল ৭২৮ খ্রি.), রাবেয়া বসরি (ইন্তেকাল ৭৭৬ খ্রি.), ইব্রাহিম দিন আদহাম (ইন্তেকাল ৭৭৭ খ্রি.), আবু-হাসিম (ইন্তেকাল ৭৭৭ খ্রি.) সহ প্রমুখ।[15]

দ্বিতীয় পর্যায় (নবম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) অতীন্দ্রিয় দার্শনিক সুফিদের। এই পর্যায়ের সুফিরা অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যা (Mystical Metaphysics) এবং দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরা হলেন:- সারি আল সাকাতি (ইন্তেকাল ৮৭০ খ্রি.), মারুফ আল-কারখি (ইন্তেকাল ৮১৫/৮১৬ খ্রি.), হাল' (আধ্যাত্মিক অবস্থা) এবং 'মকাম' (আধ্যাত্মিক মঞ্চ) মতবাদের প্রবর্তক ও ধর্মতাত্ত্বিক সুফিবাদ (Theosophical Sufism) এর প্রতিষ্ঠাতা যুননুন মিশরী (ইন্তেকাল ৮৫৯ খ্রি.), সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এর প্রবর্তক মনসুর আল হাল্লাজ (ইন্তেকাল ৯২১ খ্রি.)। পরবর্তীকালে

---

[9] শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র:), তাযকেরাতুল আউলিয়া, অনুবাদ: মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা, মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা ৬৮-৯০।

[10] ডঃ মো. বদিউর রহমান, হযরত ইমাম হাসান আল বসরী, চট্টগ্রাম, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১-১১

[11] চৌধুরী শামসুর রহমান, সূফি দর্শন, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৭৮

[12] Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, vol. 1, New Delhi, 1986. P.98

[13] চৌধুরী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮

[14] ডঃ শেহাবুল হুদা, চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪২

[15] খালিক আহমদ নিজামি, সাম আসপেক্টস অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য থার্টিয়েথ সেঞ্চুরি, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৫৩

ইমাম কুশাইরি (ইন্তেকাল ১০৭৪ খ্রি.) এবং ইমাম গাজ্জালি (ইন্তেকাল ১১১১ খ্রি.) এই মতবাদসমূহকে সুসংহত করে সুফিবাদকে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার জ্ঞান লাভের বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[16] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই পর্যায়ের শিখরে পৌঁছায় 'ওয়াহদাতুল উজুদ' তত্ত্বের প্রবক্তা শেখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (ইন্তেকাল ১২৪৮ খ্রি.), সোহরাওয়ার্দী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (ইন্তেকাল ১২৩৪ খ্রি.) এবং মসনবীর লেখক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (ইন্তেকাল ১২৭৩ খ্রি.), যাঁরা পূর্বতন চিন্তাসমূহকে সুসংহত করে সুফিবাদকে একটি অপরিবর্তনীয় দর্শন, মতবাদে রূপ দেন।[17]

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায় (দ্বাদশ শতাব্দী থেকে) সিলসিলা বা বংশানুক্রমে আধ্যাত্মিকতাপ্রাপ্ত সুফিদের। এটি বিভিন্ন তরিকা বা সিলসিলার উন্মেষ ও বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ধারণা করা হয়, পৃথিবীতে তিনশত (মতান্তরে ৪০০) তরিকা রয়েছে।[18] যদিও তরিকাসমূহের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে বাগদাদ, বসরা, তেহরান, খুরাসান ও ট্রান্সকিয়ানায়। পরবর্তী সময়ে ইরাক, ইরান, তুরস্ক, পাক-ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। এসব তরিকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-জাতিতে কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়াই আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে দেশ-দেশান্তরে বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ করে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় ও বোধগম্যতার সুবিধার্থে নিম্নে প্রধান কয়েকটি সুফি-তরিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ভারত-বাংলা উপমহাদেশে এর আগমন তুলে ধরা হলো।

১.৩. প্রধান তরিকাসমূহ ও ভারত-বাংলা উপমহাদেশে এর আগমন

নবীযুগ ও খেলাফতের সময়কালে উপমহাদেশে আরব বণিক, সাহাবি ও সুফি-সাধকের মাধ্যমে ইসলামের আগমন হলেও সিলসিলা আকারে প্রবেশ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সুফিবাদী ধারা বিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে যেসব সিলসিলার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের ও সুফি ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে 'কাদেরিয়া' 'চিশতিয়া' 'নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া' ও 'সোহরাওয়ার্দিয়া' চারটিকে প্রধান তরিকা হিসেবে তাত্ত্বিকগণ বিবেচনা করেন। উপমহাদেশের তরিকার প্রচার নিয়ে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন, "ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম চিশতিয়া তরিকার প্রচার শুরু ও সম্প্রসারিত হয়। তারপরে সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা প্রচারিত হয়। সুহরাওয়ার্দিয়ার পর কাদেরিয়া তরিকার প্রবর্তন হয় এবং কাদেরিয়ার পর নক্শবন্দিয়া-মুজাদ্দাদিয়া তরিকা প্রচার লাভ করে।"[19]

ক. চিশতিয়া তরিকা: খাজা আবু ইসহাক শামি (ইন্তেকাল ৯৪০ খ্রি.) কর্তৃক প্রবর্তিত চিশতিয়া তরিকা আফগানিস্তানের চিশত শহরে উদ্ভূত হলেও পরবর্তীতে দক্ষিণ এশিয়ায় তা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। খাজা উসমান হারুনি থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (ইন্তেকাল ১২৩৬ খ্রি.) ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের লাহোর ও আজমিরে এই তরিকার প্রসার ঘটান। তিনিই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সুফি-তরিকার প্রবর্তন করেন।[20] পরবর্তী সময়ে অপরাপর তরিকার প্রবর্তন ঘটে। রাসুলুল্লাহ (দ.) থেকে খাজা আবু ইসহাক শামি দশম ও খাজা মইনুদ্দিন চিশতি সপ্তদশ খলিফা। খাজা চিশতির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি (ইন্তেকাল ১২৩৭ খ্রি.), শেখ ফরিদউদ্দিন গাঞ্জ-ই-শকর (ইন্তেকাল ১২৬৬ খ্রি.), শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া (ইন্তেকাল ১৩২৫ খ্রি.), আঁখি সিরাজ (১৩৫৭ খ্রি.) প্রমুখের মাধ্যমে এই সিলসিলা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে।[21] বর্তমানে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ভারতের আজমিরকে চিশতিয়া তরিকার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য করা হয়। শরিয়ত

---

16 শিবলী, আল-গাজ্জালি, পৃষ্ঠা ১৮৭

17 শিবলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৭

18 Saiyed Abdul Hai, Muslim Philosophy, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982, p.143

19 ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৫

20 প্রাগুক্ত

21 এ. এম. খলীলুর রহমান, সূফীবাদ ও চারি তরীকার পীর, বগুড়া ১ম মুদ্রণ ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮

অনুসরণের পাশাপাশি গান-বাজনা, সামা'র সাহায্যে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে খোদা তায়ালার নৈকট্য হাসিল করা ও পরম সত্যের উন্মোচন ঘটানোই এই তরিকার মূল বৈশিষ্ট্য। চিশতিয়া তরিকার সাধন-কার্যক্রম ভক্তি ও প্রেমের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এ তরিকার উপ-শাখার মধ্যে খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক প্রবর্তিত 'নিজামিয়া' ও খাজা মখদুম আলী কালিয়ারী কর্তৃক প্রবর্তিত 'সাবেরিয়া' তরিকা অন্যতম। পাক-ভারত ছাড়াও সমগ্র বিশ্বে খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রায় পাঁচ শতাধিক খলিফা রয়েছে।

খ. কাদেরিয়া তরিকা: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (১০৭৭-১১৬৬ খ্রি.) কর্তৃক প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরিকা সুফিধারার সর্বপ্রথম তরিকা। তবে অনেকেই তার্তাওসিয়া তরিকা থেকে এর উদ্ভব বলে মনে করেন।[22] বড়পীর বাবার দিক থেকে নবীজীর ১১ তম ও মায়ের নসলে ১৮তম বংশধর। এ তরিকার অনেক উপ-তরিকা রয়েছে। তবে বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারত-বাংলা উপমহাদেশে কাদেরীয়া তরিকা অত্যন্ত জনপ্রিয়। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কার মাধ্যমে কাদেরিয়া তরিকার পরিচিতি ঘটে, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট মত দেয়া কঠিন। তবে বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য মত হলো- খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির অনুরোধে সিন্ধুতে বড়পীরের শাহজাদা শায়খ শরফুদ্দিন ঈসা/কাত্তাল অথবা মুলতানে বড়পীরের শাহজাদা শায়খ সাইফুদ্দিন আবদুল ওয়াহাব'র আগমনের মাধ্যমে কাদেরিয়া তরিকার আগমন হয়েছে।[23] সাইফুদ্দিন আবদুল ওয়াহাব মুলতানে মাত্র ১৮ দিন ও শরফুদ্দিন কাত্তাল সিন্ধুতে মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করে পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান।[24] পরবর্তীতে শাহবাজ কালান্দার, সখী সুলতান বাহু, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি, শাহ মখদুম রূপোশ, শাহ তুরকান প্রমুখ অসংখ্য সুফি-সাধকের বদৌলতে সমগ্র ভারতবর্ষে তরিকাটি প্রচার প্রসার লাভ করে। শরিয়তের সীমাবদ্ধতা মেনে, কোনো বিদ'আতের দ্বারস্থ না হয়ে পরমাত্মার নৈকট্য হাসিলের নিমিত্তে ভারসাম্যপূর্ণ সাধন-কার্যক্রম পরিচালনা করাই এই তরিকার মূল বৈশিষ্ট্য। কাদেরিয়া তরিকার সাধন-কার্যক্রম সাতটি বিশেষ গুণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। সারাবিশ্বে এই তরিকার অনুসারী দরবারের সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। ভারত-বাংলা উপমহাদেশে তরিকার আগমনের দিক থেকে কাদেরিয়া তরিকা তৃতীয় হলেও প্রচার প্রসারের দিক থেকে বর্তমানে তা সবার শীর্ষে। এ তরিকার উপ-শাখার মধ্যে বাংলাদেশের মাইজভাণ্ডারিয়া, আহদালিয়া, বাদাওয়িয়া, বু'আলিয়া, আশরাফিয়া, উরুসিয়া প্রমুখ তরিকা অন্যতম।[25]

গ. নকশবন্দিয়া তরিকা: বুখারার হযরত মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন নকশবন্দি আল-বুখারি কর্তৃক প্রবর্তিত নকশবন্দিয়া তরিকা সুফিধারায় অন্যতম স্বতন্ত্র সিলসিলা। এটি হযরত আবু বকর, সালমান ফারসি, বায়েজিদ বোস্তামী, আব্দুল খালিক গাজদুওয়ানি প্রমুখের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[26] বুখারা থেকে ভারতবর্ষে দুটি ভিন্ন মাধ্যমে নকশবন্দীয়া তরিকার আগমন ঘটে। ১. আমীর আবদুল্লাহ আলা আকবরাবাদীর ভারতের দানাপুর ও মারহারা অঞ্চলে আগমনের মাধ্যমে। ২. খাজা বাকি বিল্লাহ নকশবন্দীর দিল্লি আগমনের মাধ্যমে। খাজা বাকি বিল্লাহর অন্যতম খলিফা মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (ইন্তেকাল ১৬২৫ খ্রি.)। তৎকালীন মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম ও সনাতন ধর্মের মিশ্রণে 'দীন-ই-এলাহী' নামক একটি ধর্মের প্রবর্তন করেন, যা ছিল ইসলাম ধর্মের বিকৃত রূপ।[27] শেখ আহমদ সিরহিন্দী এই নব্য ধর্ম, নকশবন্দিয়া তরিকার নাচ-গান ও দীনের অন্যান্য নব্য আচার, কৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রচারণা ও সংগ্রাম চালিয়ে তা খারিজ করে দেন এবং মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর দরুন তাকে অ্যাখ্যায়িত করা হয় 'মুজাদ্দিদে আলফে

---

[22] শিব প্রসাদ শূর, সূফী জীবন দর্শন প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৩

[23] ডঃ গোলাম ইয়াহিয়া আনজাম, হিন্দুস্তান মে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া, ৪-৫ পৃষ্ঠা, ক্রিয়েটিভ স্টার পাবলিকেশন, নয়া দিল্লি, ভারত, ২০২১

[24] প্রাগুক্ত

[25] আব্দুল্লাহ আস-সাহলি, আত-তুরুকুস সুফিয়্যাহ, ৮৫ পৃ, দারু কুনুজ ইশবিলিয়া লিল-নাশর ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, সৌদি আরব, ২০০৪

[26] ডঃ মুহাম্মদ আহমদ দরনিকা, আত-তারিকাতুন নকশবন্দিয়াতু ওয়া আ'লামুহা, ১০ পৃষ্ঠা, আল-মুয়াসসাসাতুল হাদিসা লিল-কিতাব, তারাবুলুস, লেবানন, ১৯৮৭।

[27] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬

সানী' নামে। এই সংস্কার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি 'মোজাদ্দেদিয়া তরিকা' নামে একটি নতুন তরিকা প্রবর্তন করেন। এটি মূলত 'নকশবন্দিয়া' তরিকারই একটি উপ-শাখা এবং তিনি নিজেও মোজাদ্দেদিয়া তরিকাকে নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিচ্ছবি বলে মনে করতেন। নকশবন্দিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত হওয়া আরো বিভিন্ন উপ-শাখাগুলো হলো- খাজা মাসুম কর্তৃক প্রবর্তিত 'মাসুমিয়্যা' তরিকা, সাইয়্যিদ আদম বানুরী কর্তৃক 'আহসানিয়া' তরিকা।[28]

ঘ. মোজাদ্দেদীয়া তরিকা: পূর্বে বলা হয়েছে, শায়খ আহমদ সিরহিন্দী কর্তৃক প্রবর্তিত মোজাদ্দেদীয়া তরিকা, নকশবন্দিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত এবং শরিয়ত ও তরিকতের সমন্বয়ে বিকশিত হওয়া তরিকা। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী, চিশতিয়া সিলসিলার শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহি ও শায়খ রুকনুদ্দিন থেকে খেলাফত প্রাপ্ত।[29] পাশাপাশি তিনি পিতা মখদুম শায়খ আব্দুল আহাদ্দ (র.) এর অধীনে চিশতিয়া কাদেরিয়া তরিকার সুলুকের মনযিল অতিক্রম করেন। পরবর্তীতে তিনি খাজা বাকী বিল্লাহ (র.) এর বায়াত গ্রহণ করেন এবং এজাজত লাভ করেন। মোজাদ্দেদিয়া তরিকা শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে উপমহাদেশে তরিকাটি 'নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া' নামে প্রচলিত রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে মুজাদ্দিদে আলফে সানির প্রায় পাঁচ হাজার খলিফা রয়েছে, যাদের মাধ্যমে 'নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া' ব্যাপকতা লাভ করে।[30] এ তরিকার যেসব শাখা আবির্ভূত হয়েছে, তার মধ্যে- মোজাদ্দেদে আলফে সানীর পুত্র খাজা মাসুম কর্তৃক 'মাসুমিয়্যা' ও সৈয়দ আহমদ বানুরী (র.) কর্তৃক 'আহসানিয়া', সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বালাকোটী কর্তৃক 'মুহাম্মাদিয়া' তরিকা অন্যতম।

ঙ. সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা: হযরত আবু নাজিব জিয়া উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রবর্তিত সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা সুফি ধারায় একটি সুসংবদ্ধ সিলসিলা। এটি মূলত কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার মিশ্রণে ঘটিত। এটি ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত-বাংলা উপমহাদেশে বিকশিত হয়েছে। তবে আবু নাজিব জিয়া উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত গ্রন্থ 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' এর লেখক শেখ শিহাবুদ্দিন আবু হাফস উমর সোহরাওয়ার্দী (১১৪৫- ১২৩৪ খ্রি.) এর মাধ্যমে তরিকার উন্নয়ন ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রসারিত হয়। শেখ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্যদের মধ্যে শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (ইন্তেকাল ১২৬৮ খ্রি.) এবং শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী (ইন্তেকাল ১২৪৪ খ্রি.) এই তরিকাকে ভারতে পরিচিত করেন এবং মুলতান, সিন্ধু ও উচ নগরীকে সোহরাওয়ার্দী তরিকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সৈয়দ নূরুদ্দিন (ইন্তেকাল ১২৪৯ খ্রি.), কাজী হামিদউদ্দিন নাগোরী (ইন্তেকাল ১২৭৯ খ্রি.) প্রমুখ উপমহাদেশে এই তরিকার ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটান। শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মতে, জওক (আধ্যাত্মিক স্বাদ গ্রহণ) ও ওয়াজেদ (উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা) হলো এই তরিকার ভিত্তি।[31]

চ. সাত্তারিয়া তরিকা: শাহ সিরাজউদ্দীন আব্দুল্লাহ সাত্তারী (ইন্তেকাল ১৪৮৫ খ্রি.) কর্তৃক প্রবর্তিত সাত্তারিয়া তরিকা সুফি ধারায় তাইফুরিয়া খান্দানের একটি সিলসিলা। এটি লোদি শাসনামলে ভারতে আগত হয়ে স্বল্পকালীনভাবে বিকশিত হয়েছে। শাহ মুহাম্মদ গউস (ইন্তেকাল ১৫৬৩ খ্রি.) উপমহাদেশে এই তরিকার বিস্তার ঘটান এবং গোয়ালিয়রকে কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। শাহ মুহাম্মদ গাউস মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের শিক্ষক এবং 'জাওহির-ই-খামস'র লেখক। এছাড়াও শায়খ ওয়াজিহুদ্দিন আলভী (ইন্তেকাল ১৬০৯ খ্রি.) এর মাধ্যমে আহমেদাবাদে ও শায়খ সিবগাতুল্লাহ আল হিন্দি আল বারওয়াজি (ইন্তেকাল ১৬০৬ খ্রি.) এর মাধ্যমে মদিনায় তরিকার প্রচার প্রসার ঘটে।[32]

---

[28] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭-১৭১

[29] জালালুদ্দীন আহমদ আর-রাভী নকশবন্দি মুজাদ্দেদি, রিসালায়ে তরিকা-এ-আলিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া, rekhta books pdf

[30] প্রাগুক্ত

[31] ডঃ শেহাবুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪

[32] প্রাগুক্ত; সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯

উল্লেখিত সুফি-তরিকাসমূহ ছাড়াও আরো বিভিন্ন তরিকার সুফি-সাধকগণ পাক-ভারত বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। তন্মধ্যে মাদারিয়া, কলন্দরিয়া, ওয়াইসিয়া, মাসুমিয়া, আদহামিয়া, কুবরাইয়া তরিকা অন্যতম।

দ্বিতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রামের সুফি-সমাজে তরিকাসমূহ

সূচনালগ্নেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। ইতিহাসবেত্তাদের অভিমত ও জনশ্রুতি অনুসারে, নবীজীর হিজরতের পূর্বে ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ও ইসলামের প্রচারে বাদশাহ নাজ্জারির দেওয়া জাহাজে করে পাঁচজন সাহাবী সামন্দর (চট্টগ্রাম) বন্দরে আগমন করেন। হযরত আবু ওয়াক্কাস, মালিক ইবনে ওয়াহাব'র নেতৃত্বে হযরত তামীম আনছারি, হযরত কায়েস ইবনে হায়ফরি, হযরত উরয়াহ ইবনে আছম শাহ, হযরত আবু কায়েস ইবনে হারিস।[33] তাঁরা বন্দরে চার বছর অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হযরত উমর (১৩-১৪ হিজরী) এর আমলে আরব থেকে আরো ৭ জন তাবেয়ী[34] সামন্দর বন্দরে আসেন। শুরুর দিককার বিভিন্ন সময়ে আরো পাঁচটি দল চট্টগ্রামে আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।[35] এভাবে সাহাবায়ে কেরামের হাতে ইসলাম কবুল করা তাবেয়ী ও ধীরে ধীরে আগত আরব বণিক ও সুফিদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারিত হয়।

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে, সুদূর আরব ও অন্যান্য দেশে সর্বপ্রথম বারো (১২) জন আউলিয়া (সুফি-সাধক) ইসলাম প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে আগমন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এই অঞ্চলে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকার কারণেই চট্টগ্রামকে "বার আউলিয়ার দেশ বা পুণ্যভূমি" বলা হয়। 'বারো আউলিয়া' নিয়ে এই জনশ্রুতি ইতিহাসবেত্তা ও সুফি-সাধক দ্বারা স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য। তবে চট্টগ্রামে এতো বেশি সুফিদের আগমন হয়েছে ও মাজার রয়েছে যে, "বারো আউলিয়া কারা?" এই প্রশ্নের উত্তরে এখনো বেশ ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে প্রাচীন গ্রন্থ ও কাব্য পর্যালোচনা করে উত্তর খোঁজায় ইতিহাসবিদরা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'চট্টগ্রামে ইসলাম'[36], গোলাম সাকলায়েনের 'বাংলাদেশের সুফি সাধক'[37] ও ডঃ আবদুল করিমের 'বাংলার সুফি সমাজ ও বারো আউলিয়া" গ্রন্থ[38] উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের পটিয়া থেকে আরবী ভাষায় লিখিত মাত্র ৪৪ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। তাতে সুফিদের কয়েকটি তালিকা পাওয়া যায়। তা হলো: দারওয়াজদা আউলিয়া (বারো আউলিয়া), পীর পঞ্জা (পাঁচ পীর), চেহেল আবদাল (চল্লিশজন আবদাল), জুমলা আউলিয়া (সকল সুফি) এবং চাহার পীর (চার পীর)।[39]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসনের আগমনের সাথে ইসলামের প্রচার আরও জোরদার হয়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পর, সোনারগাঁও-এর সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.) চট্টগ্রাম জয় করেন এবং এখানে মসজিদ, মাজার এবং রাজপথ নির্মাণ করেন। ইবনে বতুতার বিবরণে উল্লেখ আছে যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম, সিলেট এবং সোনারগাঁও-এ সুফিদের ব্যাপক যাতায়াত ছিল।[40] সুলতানরা সুফিদের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাতেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতেন। সুফিরা ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যে বিশেষভাবে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে মোগল যুগে (১৫৭৬-

---

[33] জামাল উদ্দিন, পীর আউলিয়ার পুন্যভূমি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪

[34] ৭ জন তাবেয়ী হলেন- হযরত মোহাম্মদ মামুন (রা.), হযরত মোহাম্মদ মোহাইমেন (রা.), হযরত মোহাম্মদ আবু তালেব (রা.), হযরত মোহাম্মদ মর্তুজা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ (রা.), হযরত হামিদ উদ্দিন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দিন (রা.)।

[35] জামাল উদ্দিন, দেয়াঙ পরগণার ইতিহাস (আদিকাল), ৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭৩-৭৪

[36] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৬

[37] ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ঢাকা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৯-৩০

[38] ডঃ আবদুল করিম, বাংলার সুফি সমাজ ও বারো আউলিয়া, ঢাকা, ২০২৩, পৃষ্ঠা ২৯

[39] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬-৭০

[40] আল ইদ্রিসী, নূজহাত আল মুশতাক (অনুবাদ Eliot, The Arb Geographers), পৃষ্ঠা ৯০-৯১

১৬৬৬ খ্রি.) চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে থাকলেও মুসলিম ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। আরাকান রাজারা মুসলমান গভর্নরদের সাহায্যে শাসন করতেন এবং মুসলমানী নাম গ্রহণ করতেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ ওমেদ খাঁ চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন।[41]

বারো আউলিয়া ও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সুফি-সাধকদের আগমনের সাথে সাথে চট্টগ্রামে বিভিন্ন সুফি তরিকার প্রচার শুরু হয়। তরিকাগুলো মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ হয়ে এই অঞ্চলে প্রসারিত হয়, যার মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় ও স্থানীয় সমাজে ইসলামের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম কাদেরিয়া তরিকার প্রচার শুরু হয়, তারপর সোহরাওয়ার্দী তরিকার আগমন ঘটে। এরপর চিশতিয়া তরিকার আগমন হয়, পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর খলিফাদের মাধ্যমে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকা ব্যাপকতা লাভ করে। সর্বশেষ, চট্টগ্রাম ভূমিতেই কাদেরিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত ও চিশতিয়া তরিকার যোগসাজশে মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তন হয়। নিম্নে তরিকাগুলোর চট্টগ্রামে আগমন ও উদাহরণস্বরূপ তরিকার অনুসারী প্রধান প্রধান দরবারসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো।

২.১. কাদেরিয়া তরিকা

পূর্বে (১.৩.খ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে সুফি-সাধকের আগমনের মাধ্যমে কাদেরিয়া তরিকা এতো বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, উপমহাদেশে সর্বপ্রথম এই তরিকা কার মাধ্যমে আগমন করেছে তা নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। অনুরূপ, বাংলাদেশে বিশেষত চট্টগ্রামেও প্রথম কাদেরিয়া তরিকার আগমন নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা রয়েছে। ধারণা করা হয়, হযরত সৈয়দ আহমেদ শাহ তন্নুরী ওরফে শাহ মীরান (ইন্তেকাল ১৩০৩ খ্রি.) এর মাধ্যমে বাংলায় (নোয়াখালী অঞ্চলে) সর্বপ্রথম কাদেরিয়া তরিকার আগমন ঘটে।[42] শাহ মিরান বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর পৌত্র ছিলেন। তবে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন, "ভারত-বাংলা উপমহাদেশে কাদেরিয়া তরিকার প্রথম প্রচারক সৈয়দ মোহাম্মদ গউস (ইন্তেকাল ১৫১৭ খ্রি.)"।[43] পরবর্তীতে সমগ্র বাংলাদেশে শাহ মীরানের বড় ভাই শাহ মাখদুম রূপোশ, শাহ মোহাম্মদ নূর, হযরত হামিদুদ্দীন গৌড়ীসহ অসংখ্য সুফি-সাধক ও তাদের খলিফাদের মাধ্যমে তরিকা জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা লাভ করে। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নোয়াখালীতে শাহ মীরানের আগমন ও সমগ্র দেশে তাঁর সঙ্গী ও খলিফাদের ছড়িয়ে পড়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনায় নিলে সৈয়দ শাহ মীরানের খলিফাদের কেউ কেউ চট্টগ্রামে আগমনের কথা আঁচ করা যায়। তবে ঐতিহাসিকভাবে চট্টগ্রামে প্রথম কাদেরিয়া তরিকার খলিফাদের আগমনের তথ্য পাওয়া যায় হযরত হামিদুদ্দীন গৌড়ীর মাধ্যমে।[44] যিনি বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর ৮ম অধস্তন পুরুষ। তিনি বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে ১৫৭৫ সালে তিনি চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চননগরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তাঁর বংশধর থেকেই পরবর্তীতে মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত হামিদুদ্দীন গৌড়ী ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, বাগদাদ থেকে কাদেরীয়া তরিকার অসংখ্য খলিফা চট্টগ্রামে আগমন করে তরিকার প্রচার প্রসার ঘটান।

নিম্নে কাদেরিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত হাল আমলের প্রধান প্রধান দরবারসমূহের আবির্ভাব ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

---

41 ওহিদুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, বইঘর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫১-৫৪

42 আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৫১

43 ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

44 হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত: মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, ২০-২১

মির্জাখীল দরবার শরীফ: সাতকানিয়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি সিলসিলায়ে কাদেরিয়া চিশতিয়া আবুল উলাইয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারটি শাহ জাহাঁগির মাওলানা সাঈদী (ইন্তেকাল ১৮৮৫ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।[45] তিনি ভাগলপুরের শাহ সৈয়দ এমদাদ আলী (ইন্তেকাল ১৮৮৭ খ্রি.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে 'শরহুচ্ছুদুর ফি দফয়িশ শুরুর' অন্যতম। এই তরিকার অন্যতম খলিফা হলেন, পীর মোখলেছুর রহমান জাহাঁগিরির পুত্র ও খলিফা ফখরুল আরেফীন আবদুল হাই জাহাঁগিরি (ইন্তেকাল ১৯২১ খ্রি.)। তিনি একাধারে সাত সিলসিলায় ১. কাদেরীয়া সোহরাওয়ার্দীয়া, ২. চিশতিয়া ক্বলন্দরিয়া, ৩. নকশবন্দীয়া আবুল উলাইয়া, ৪. ফেরদৌসিয়া, ৫. রাজ্জাকীয়া, ৬. চিশতিয়া নেজামিয়া কুদ্দুসিয়া ও ৭. সাবেরীয়া কুদ্দুসিয়া তরিকায় বায়াত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[46] তবে পিতার প্রবর্তিত জাহাঁগীরিয়া সিলসিলার নিয়মে কাদেরীয়া তরিকা মতেই বায়াত ও তরিকা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এবং তার হাত ধরেই অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশে জাহাঁগীরিয়া সিলসিলা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। তিনি প্রায় দুইশতের অধিক কিতাব ও রেসালা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে, 'তাহকীকুল আজাবীর ফি ছেমায়িল মজামীর'[47], 'বাহরুল বুরহান শরহে এতকান'[48], 'হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়াহ্'[49], 'হাশিয়াহ আলা শরহে মুল্লা জমী লিল আল্লামা আবদুল গফুর'[50], 'আততালিকুল আনওয়ার আলা শরহে ফিকহে আকবর'[51] অন্যতম। এ সিলসিলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, সৌদিআরবের সঙ্গে মিল রেখে হিজরী সন অনুসরণ করা এবং এ মোতাবেক রোজা, ঈদ পালন করা।

দরবার-এ বেতাগী আস্তানা শরীফ: রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি আল্লামা হাফেজ হাকিম শাহ বজলুর রহমান মোহাজেরে মক্কী (রহ:) (ইন্তেকাল ১৯৪৮ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঢাকার মুশুরীখোলা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর শাহ সূফি আহসানুল্লাহ (ইন্তেকাল ১৯২৬ খ্রি.) দ্বারা খেলাফতপ্রাপ্ত হন। শাহ সূফি আহসানুল্লাহ একাধারে চারটি তরিকার খলিফা ছিলেন। বাগদাদের হযরত কালীম শাহ বাগদাদী দ্বারা কাদেরিয়া তরিকা, হযরত খাজা লশকর মোল্লা দ্বারা চিশতিয়া তরিকা ও নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে স্বপ্নযোগে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর নির্দেশে কাদেরিয়া তরিকায় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শাহ বজলুর রহমান, হযরত ওমর ফারুক ও মোজাদ্দেদে আলফে সানীর পুত্র পীর মাসুমের উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯২০ সালে ব্রিটিশ রেজিম দ্বারা গ্রেফতার হন। ১৯৪৮ সালে পবিত্র হজ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কায় গমন করলে ১৪ই অক্টোবর তিনি মিনায় ইন্তেকাল করেন। বর্তমানে রাঙ্গুনিয়ায় তাঁর আস্তানা শরীফ রয়েছে এবং উত্তরসূরীরা তরিকার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলমগীর খানকা-এ-কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যিবিয়া: চট্টগ্রাম শহরেই অবস্থিত এই দরবার পাকিস্তানের দরবারে সিরিকোট শেতালু কর্তৃক পরিচালিত হয়। দরবারটি কাদেরিয়া আলিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোট (ইন্তেকাল ১৯৬১ খ্রি.) ভারত, বার্মা হয়ে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আগমন করেন।[52] তিনি খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (ইন্তেকাল ১৯২৪ খ্রি.) কর্তৃক খেলাফতপ্রাপ্ত। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র সৈয়দ তৈয়ব শাহ (ইন্তেকাল ১৯৯৩ খ্রি.) এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে সিলসিলাটি ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানে সিলসিলাটি পাকিস্তানের পাশাপাশি

---

[45] শিব প্রসাদ শূর, সূফী জীবন দর্শন প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ২০১০, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬

[46] প্রাগুক্ত

[47] সংগীতের সিদ্ধাসিদ্ধের বিষয়ে আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ।

[48] ইলমে উসুলে তাফসির বিষয়ে রচিত হজরত আল্লামা জালালুদ্দীন ছুয়ুতী শাফেয়ী এর (রঃ) "আল এতকান ফি উলুমিল কোরান" নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

[49] হানাফী মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থ "শরহে বেকায়াহ" এর উপর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ

[50] আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বপ্রধান পুস্তক "কাফিয়ার" ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

[51] মোল্লা আলী কারী (রঃ) রচিত "শরহে ফেকাহ আকবর"এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

[52] শাজরা শরীফ, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া, পাকিস্তান, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১০

বাংলাদেশে আলমগীর খানকা-এ-কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যিবিয়া ও সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা (১৯৫৪ খ্রি.) কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়ে থাকে।

বায়তুশ শরফ দরবার শরীফ: ডাবলমুরিং উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (ইন্তেকাল ১৯৭১ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৮ সালে 'বায়তুশ শরফ' নামীয় একটি জুম'আ মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরবারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। মীর মোহাম্মদ আখতার, সৈয়দ মোনছরম শাহ কাদেরি কর্তৃক কাদেরিয়া, ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী থেকে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত হন।[53] তবে তিনি তরিকায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার অনুসারী ছিলেন, যা তার পরবর্তী খলিফা অব্যাহত রাখেন।

আল-আমিন বারিয়া দরবার শরীফ: চান্দগাঁও থানায় অবস্থিত দরবারটি ১৯৬৮ সালে সৈয়দ আবদুল বারী শাহজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি লক্ষ্মৌর সুফি সৈয়দ দায়েম লক্ষ্মৌবী (রহ.) থেকে কাদেরীয়া আলীয়া তরিকা ও নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বংশধর হযরত পীরে জামীন শাহ আল বদায়ুনী থেকে চিশতিয়া-নিজামিয়া তরিকায় খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তবে বর্তমানে সৈয়দ আবদুল বারী শাহজীর বড়পুত্র হযরত বদরুদ্দোজা বারী সিলসিলায়ে কাদেরীয়া আলীয়ার অনুসারী এবং ছোটপুত্র হযরত শামসুজ্জোহা বারী চিশতিয়া তরিকার অনুসারী, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

দরবারে হাশেমিয়া আলিয়া শরীফ: বায়েজিদ থানায় অবস্থিত দরবারটি সিলসিলা-এ কাদেরিয়া চিশতিয়া নেযামিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া হাশেমিয়া আলিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতা কাযী আহসানুজ্জান হাশেমী কর্তৃক খেলাফত লাভ করে আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী (ইন্তেকাল ২০২০ খ্রি.) বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন। কাযী আহসানুজ্জান হাশেমী একাধারে কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলা থেকে খেলাফত পেয়েছিলেন। এই হাশেমী বংশ সরাসরি রাসুলুল্লাহ (দ.) পৌত্র ইমাম হোসাইনের সাথে মিলিত হয়।

আল-আমিন হাশেমী দরবার শরীফ: বায়েজিদ থানার কুলগাঁও-এ অবস্থিত দরবারটিও সিলসিলা-এ কাদেরিয়া চিশতিয়া নেযামিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া হাশেমিয়া আলিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমীর ভাই ও পিতা কাযী আহসানুজ্জান হাশেমী কর্তৃক খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লামা কাযী মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম হাশেমী (ইন্তেকাল ২০১৭/১৮ খ্রি.) দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন। আমিনুল ইসলাম হাশেমী ১৯৫২ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও মধ্যকার অপরাপর আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জাঁহাগিরিয়া শাহছুফি মমতাজিয়া দরবার শরীফ: চন্দনাইশের কাঞ্চননগরে অবস্থিত দরবারটি 'আলিয়া কাদেরিয়া চিশতিয়া জাহাঁগিরিয়া' সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহসুফি আমজাদ আলী নুরুল হুদা (রহ:) (ইন্তেকাল ১৯৩৯ খ্রি.), সাতকানিয়ার মির্জাখীল দরবারের খলিফা ফখরুল আরেফীন আবদুল হাই জাহাঁগিরি (ইন্তেকাল ১৯২১ খ্রি.) বায়াত গ্রহণ করার ১৯ বছর পর খেলাফতপ্রাপ্ত হন। মির্জাখীল দরবারের মতো এই দরবারও সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে হিজরী সন অনুসরণ এবং রোজা, ঈদ পালন করে থাকেন।

বাইনজুরী দরবার শরীফ: চন্দনাইশ ইসলামাবাদে অবস্থিত দরবারটি হযরত শাহ মৌলানা নাদেরুজ্জামান খাঁন (ইন্তেকাল ১৯৯০ খ্রি.) কর্তৃক 'আলিয়া কাদেরিয়া চিশতিয়া জাহাঁগিরিয়া' সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি সিলসিলায়ে আলীয়া জাহাগিরিয়া খলিফা হযরত শাহ মৌলানা আব্দুল ওহাব কমল শাহ এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন

[53] কে. এম. মাহফুজুল করিম, পীর মাওলানা মোঃ আবদুল জব্বার এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান, চট্টগ্রাম, মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৪২-৪৯

এবং ১৯৫৬ সালে খিলাফত প্রাপ্ত হন। তার পিতাও একজন বিখ্যাত সুফি ও কবি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হযরত শাহ মৌলানা মোশারফ আলি ফকির, 'দেশ বর্গ' নামে ওনার বিখ্যাত রচনা রয়েছে।

নঈমীয়া দরবার শরীফ: আনোয়ারার বুরুমচড়ায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ ছৈয়দুল খায়ের নঈমী আল কাদেরী নকশবন্দী, 'কাদেরিয়া নঈমীয়া' সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সিলসিলার প্রাণপুরুষ সৈয়দ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (রহ:), যিনি শাহ মুহাম্মদ গুল কাবুলী থেকে 'কাদেরিয়া', ইমাম আহমদ রাজা খান বেরেলভী থেকে 'কাদেরিয়া রেজভিয়া' ও সৈয়দ মুহাম্মদ আলী হোসেন আশরাফি মিয়াঁ থেকে 'চিশতিয়া আশরাফিয়া' সিলসিলা থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ধারা প্রবর্তন করেন। ছৈয়দুল খায়ের নঈমী নকশবন্দী (ইন্তেকাল ১৯৯১ খ্রি.), মাওলানা আবদুর রহমান আল কাদেরী (ইন্তেকাল ১৯৫৯/৬০ খ্রি.) হাতে বায়াত গ্রহণ করে সিলসিলায় দাখিল এবং পরবর্তীতে খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

হাইদ চকিয়া দরবার শরীফ: ফটিকছড়ি উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি আল্লামা শাহসুফি হাফেজ দৌলত খান ফিরিঙ্গীবাজারের শাহ সাহেব (ইন্তেকাল ১৯৭৯/৮০) কর্তৃক কাদেরিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি হযরত সফিউল্লাহ শাহ দ্বারা খেলাফতপ্রাপ্ত হন। সফিউল্লাহ শাহ একাধারে চার তরিকা, কাদেরিয়া চিশতিয়া নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়ার খলিফা ছিলেন। হাফেজ দৌলত খান শুরুতে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীবাজারে খানকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তরিকার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

কাগতিয়া আলিয়া গাউসুল আজম দরবার শরীফ: রাউজান উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি কাদেরিয়া মুনিরিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। গাউছুল আজম ছৈয়দ তফাজ্জল আহমদ মুনিরী (ইন্তেকাল ২০১৬ খ্রি.) হালিশহর দরবারের পীর হাফেজ মুনির উদ্দিন কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৫ সালে দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন। তফাজ্জল আহমদ মুনিরীর বংশপরম্পরা সুলতান বখতেয়ার মাহি সাওয়ার (বারো আউলিয়ার একজন) হয়ে রাসুলুল্লাহ (দ.) এর সঙ্গে মিলিত হয়। তবে তফাজ্জল আহমদ মুনিরীর খেলাফত নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। হালিশহর দরবার থেকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'এলান' নামের সতর্কবার্তা পুস্তিকায়, হাফেজ মুনির উদ্দিন কর্তৃক খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি নাকচ করা হয়।

ছিপাতলী গাউসিয়া আজিজীয়া শাহী দরবার শরীফ: হাটহাজারী উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত দরবারটি কাদেরিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (ইন্তেকাল ২০১২ খ্রি.) দরবারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তবে এতে তরিকার কার্যক্রম পরিচালিত না হলেও আল্লামা বহু লেখনীর মাধ্যমে তরিকা ও আকিদায়ে আহলে সুন্নাতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় ছিলেন।

খিতাপচর শাহ মাবুদিয়া দরবার শরীফ: চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি আল্লামা আবদুল মাবুদ আল কাদেরী (ইন্তেকাল ১৯৮৫/৮৬ খ্রি.) কর্তৃক কাদেরিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কাদেরিয়া তরিকার পীর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (১৯০৬- ১৯৬৯ খ্রি.) থেকে খেলাফত প্রাপ্ত। আর গাজী শেরে বাংলা আন্দরকিল্লা মসজিদের সৈয়দ আব্দুল হামিদ বাগদাদী (রহঃ) থেকে বেলায়েতর সর্বোচ্চ খেলাফত লাভ করেন।

শীতলপুর দরবার শরীফ: সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়িতে অবস্থিত দরবারটি শাহসুফি সৈয়দ মাওলানা আবদুল হাদী আল-কাদেরী শীতলপুরী (ইন্তেকাল ১৯৪১ খ্রি.) কর্তৃক কাদেরিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে বর্তমানে আবদুল হাদী শীতলপুরীর বংশধরগণ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটির সিলসিলার অনুসারী।

২.২. মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকা

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯০৬ খ্রি.) কর্তৃক প্রবর্তিত ও বাংলাদেশে সৃষ্ট একমাত্র সুফি তরিকা। মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকাটি মূলত কাদেরিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত। বর্তমানে এটি 'আহমাদিয়া কাদেরিয়া গাউসিয়া' সিলসিলার 'মাইজভাণ্ডারীয়া' নামে স্বতন্ত্র তরিকা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী হলেন– রাসুলুল্লাহ (দ.) এর বংশধর ও বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর ৮ম অধস্তন পুরুষ সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী বাগদাদী (১৫৫০-১৬৪৮) এর ৫ম অধস্তন পুরুষ।[54] তিনি সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ লাহোরী থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং কাদেরিয়া তরিকায় খেলাফত অর্জন করেন। পাশাপাশি পীর ছালেহ লাহোরীর বড় ভাই সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ এর কাছে এত্তাহাদী কুতুবিয়তের ফয়েজপ্রাপ্ত হন। পরে, পীরের নির্দেশে ১৮৫৭ সালে মাইজভাণ্ডার ফিরে "মাইজভাণ্ডারী দরবার শরীফ" এর গোড়াপত্তন করেন। সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে অসংখ্য সুফি-সাধক সমগ্র গ্রাম বাংলায় তরিকা প্রচার প্রসার করেছেন। এই খলিফাদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা না গেলেও মাইজভাণ্ডার দরবারের একটি প্রেস থেকে ২০৪ জন খলিফার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।[55] মানব মুক্তি, রবের নৈকট্য লাভের জন্য ও নফছে ইনসানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করতে 'উছুলে ছাবয়া'[56] নামে বিশেষ সাতটি পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। কাদেরিয়া থেকে উদ্ভূত হলেও এতে চিশতিয়া তরিকার যোগসাজশ রয়েছে। তাই চিশতিয়া তরিকার মতো মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকা ও এর সকল শাখায় সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এটি সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দরবার।

নিম্নে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত হাল আমলের প্রধান দরবারসমূহের আবির্ভাব ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ: ফটিকছড়ি উপজেলায় অবস্থিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত। ১৮৫৭ সালে সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী স্বীয় পীরের নির্দেশে নিজ গ্রাম মাইজভাণ্ডারে ফিরে সুফি-সাধক ও ভক্তবৃন্দের জন্য দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে দরবারটিকে কেন্দ্র করে ভ্রাতুষ্পুত্র গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯৩৭ খ্রি.), পুত্রবংশীয় নাতি ও একমাত্র উত্তরাধিকারী দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯৮২ খ্রি.)সহ প্রমুখ তরিকার প্রচার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রথম লিখিতভাবে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার মৌলিক ভাবাদর্শ ও বৈশিষ্ট্যাবলী বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের প্রয়াস নেন এবং তিনি ছোট–বড় ১০টি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। দরবারে নানা ধর্ম-বর্ণের লক্ষাধিক ভক্তবৃন্দের সম্মিলনে প্রতিবছর হযরতদের ওরশ ও বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উদযাপন করা হয়।

ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ: হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ গ্রামে অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (১৮৬৬-১৯৪৪ খ্রি.) কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক জীবনে তিনি মাইজভাণ্ডারের ঘোর বিরোধী থাকলেও পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। সৈয়দ ফরহাদাবাদী অসাধারণ লিখনি ও মোনাজারার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকা বর্তমানের সাথে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে ও প্রচার প্রসার ঘটাতে অনন্য ভূমিকা রাখেন। হজরত আজিজুল হক ওরফে শেরে বাংলার 'দেওয়ানে আজীজ'

---

[54] সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী, গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭।

[55] সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী, প্রাগুক্ত, ১৯৬৭

[56] 'উসুলে ছাবয়া' দুভাগে বিভক্ত। ১. ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তরঃ ক) ফানা আনিল খাল্ক- পরমুখাপেক্ষী না হওয়া। খ. ফানা আনিল হাওয়া- অনর্থক কাজকর্ম হতে বিরত থাকা। গ. ফানা আনিল এরাদা- নিজ ইচ্ছা বাসনাকে খোদার ইচ্ছায় বিলীন করা। এবং ২. মাউতে আরবা বা প্রবৃত্তির চতুর্বিধ মৃত্যুঃ ক) মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যু, খ) মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু, গ) মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু, ঘ) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু। বিস্তারিত জানতে: মাওলানা মোঃ ইকবাল ইউসুফ, মাইজভান্ডার শরীফ; ঐশী প্রেক্ষিত, চট্টগ্রাম, ২০০২।

গ্রন্থে, দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তাঁর 'বেলায়েতে মোতলাকা' গ্রন্থে এবং সৈয়দ আবদুল হামিদ বোগদাদী কাবা শরীফে আরববাসীদের নিকট সৈয়দ ফরহাদাবাদীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বারংবার স্মরণ করেন।

আহলা দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত হযরত কাজী আসদ আলী শাহ (ইন্তেকাল ১৯১৫ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার দরবার। কাজী আসদ আলী, মাইজভাণ্ডার দরবারের গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর হাতে বায়াতকৃত। কাজী আসদ আলীর উর্দ্ধতন পুরুষ শায়খ শাহ মোহাম্মদ গৌড়ী বাগদাদ থেকে তৎকালীন বাংলার গৌড়রাজ্য হয়ে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নবীজীর নির্দেশে ও দিল্লী সম্রাটের আমন্ত্রণে বোয়ালখালীর করলডেঙ্গা পাহাড়ে পাদদেশে আগমন করেন। যা আহ্লা শেখ চৌধুরী পাড়া বা 'আহ্লা দরবার শরীফ' নামে প্রসিদ্ধ। কাজী আসদ আলী শাহের ইন্তেকালের পরে পুত্র নুরুল ইসলাম আল-কাদেরি এবং নাতি সেহাবুদ্দীন খালেদ দরবারের প্রচার প্রসার ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন, এর ধারা এখনো চলমান।
উল্লেখ্য, কাজী আসদ আলী শাহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুর্দাদের সাথে কথা বলতে পারা। এই গুণাবলে তিনি বোয়ালখালী উপজেলার খিতাপচর গ্রামে "হযরত ইউসুফ শাহ আলাই আল আরাবী"র মাজার আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, ইউসুফ শাহ আলাই আরাবী সুদূর আরব থেকে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন, তখন চট্টগ্রাম মগদের রাজ্য ছিল। স্থানীয়রা তাঁকে বার আউলিয়ার একজন বলে মনে করেন। তাঁর মাজার বর্তমানে **"খিতাপচর আটতলা দরবার শরীফ"** নামে পরিচিত।

সাতগাছিয়া দরবার শরীফ: এটি পটিয়া উপজেলায় অবস্থিত শেখ সৈয়দ কাজী ওয়ারেছ বিল্লাহ সুলতানপুরী (ইন্তেকাল ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক কাদেরিয়া দায়েমিয়া ওয়ারেছিয়া খায়রিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত দরবার। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত দরবারটি পরবর্তীতে তা বংশধর ও খলিফা মোজাহেরুল ইসলাম সুলতানপুরী ও সৈয়দ আবুল খায়ের সুলতানপুরীর সময়কালে ব্যাপকতা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা কাজী ওয়ারেছ বিল্লাহ সুলতানপুরীসহ উর্ধ্বতন পুরুষদের কাদেরিয়া মুনিরিয়া সিলসিলার হলেও বংশধর ও খলিফা সৈয়দ মুজিবুল্লাহ সুলতানপুরী ও মতিউর রহমান সুলতানপুরী-দুই সহোদর সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। ফলে এটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত দরবার।

আমির ভাণ্ডার দরবার শরীফ: পটিয়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ আমিরুজ্জামান শাহ (ইন্তেকাল ১৯২৭ খ্রি.) বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আমিরুজ্জামান শাহের পূর্বপুরুষ নবীজীর বংশধর কাজী হামিদ উদ্দিন গৌড়ি দিল্লি থেকে ১৫৭৫ সালে পটিয়ার কাঞ্চননগরে আসেন, পরবর্তীতে ওই গ্রামকে তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও/হাইদগাঁও নামকরণ করা হয়। সৈয়দ আমিরুজ্জামান, আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর হাতে বায়াত গ্রহণ করে, বার বছরের বেশি সময় তরিকত চর্চা ও সাধনা করার পর মাইজভাণ্ডারীয়া সিলসিলার খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

চরণদ্বীপ দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর প্রথম ও প্রধান খলিফা শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী চরণদ্বীপি ১৮৮৩ সালে খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে দরবারটি প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি হযরত ওমর ফারুক (রা) এর বংশধর বিধায় ফারুকী উপাধি লাভ করেন। তাঁর থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে বোয়ালখালী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, চন্দনাইশসহ বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা হয়।

‘রাহে ভাণ্ডার দরবার শরীফ’ ও ‘চট্টগ্রাম দরবার শরীফ’: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাহে ভাণ্ডার দরবারের প্রতিষ্ঠাতা ছৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ (ইন্তেকাল ১৯৬৭ খ্রি.) সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর হাতে বায়াত ও খেলাফতপ্রাপ্ত হন। ছৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ মূলত রাহে ভাণ্ডার দরবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলার দক্ষিণ রাজানগর গ্রামে। কিন্তু পরবর্তীতে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রচার প্রসারে তাঁর উল্লেখ ভূমিকায় ছৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল মালেক শাহের মাধ্যমে বোয়ালখালীতে ‘চট্টগ্রাম দরবার শরীফ’ নামে একটি দরবার প্রতিষ্ঠা করেন, যা শুরুতে “ছালেকুর রহমান শাহের আস্তানা” নামে পরিচিত ছিল। আবদুল মালেক শাহের জীবদ্দশায় “চট্টগ্রাম দরবার শরীফ” নামে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র ও খলিফা সৈয়দ জাফর সাদেক শাহ রাহে ভাণ্ডারের তরিকার প্রচার-প্রসারে মনোনিবেশ করেন, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকা ও সাধন-প্রক্রিয়ার উপর ছৈয়দ জাফর সাদেক শাহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান রচনা করেছিলেন।

ঈছাপুরী দরবার শরীফ: ফটিকছড়ির নানুপুরে অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবদুচ্ছালাম ঈসাপূরী (ইন্তেকাল ১৯৮৪ খ্রি.) সৈয়দ আহমদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর বেশারতপ্রাপ্ত ও আশীর্বাদপুষ্ট এবং গাউছুল আজম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন। তিনি গৌড় থেকে আগত হামিদ উদ্দিন গৌড়ির উত্তরসূরী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি শরিয়ত, তরিকত ও তাসাউফ বিষয়ক একশত চারটি কিতাব রচনা করেন।

হাফেজনগর দরবার শরীফ: চন্দনাইশের সাতবাড়িয়ায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ ফজলুর রহমান হাফেজ নগরী (ইন্তেকাল ১৯৩২ খ্রি.), সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি কানপুরে থাকা অবস্থায় নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া ও চিশতিয়া তরিকার খেলাফত পেয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে তাঁর চল্লিশের অধিক খলিফা ‘সিলসিলায়ে আলিয়া হাফেজ নগরীয়া’ তরিকার প্রচার ও প্রসার করেন।

চরণদ্বীপ হারবাংগীরি দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আমিনুল হক হারবাংগিরী শাহ্, সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়। হারবাংগিরীর লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘ফকির উল্লাস’ ও ‘ওফাত নামা’ অন্যতম। বর্তমানে তাঁর বংশধরদের দ্বারা তরিকতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

হাওলাপুরী দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস হাওলাপুরী, ঢাকার আজিমপুরের হযরত শাহ্ সুফি দায়েম পাক (ইন্তেকাল ১৭৯৯ খ্রি.) এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর কাছ থেকেও খেলাফত প্রাপ্ত হন। তবে সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস হাওলাপুরী ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকেন।

চন্দনাইশ দরবার শরীফ: চন্দনাইশ উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর খলিফা ছৈয়দ মাওলানা আবদুল লতিফ শাহ চন্দনাইশী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মাইজভাণ্ডারী সুফিধারার গান/কালামের রচিয়তাদের অন্যতম। তিনি মোরাকাবার মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে বাবা ভাণ্ডারীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

আজিজ ভাণ্ডার দরবার শরীফ: বোয়ালখালীর খিতাপচরে অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল আজিজ শাহ আল-খিতাপচরী, সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম খলিফা। তাঁর জীবদ্দশায় ও ওফাতের পর বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য সুফি তাঁর মাহাত্ম্যের বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

পূর্ব বড়লিয়া দরবার শরীফ: পটিয়ার পূর্ব বড়লিয়া গ্রামে দরবারটি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর খলিফা মাওলানা শাহসুফি ঠান্ডা আলী শাহ কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

মধুপুর দরবার শরীফ: কক্সবাজারের মহেশখালীর কালারমারছড়ায় সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর খলিফা হযরত মকসুদুল করিম মধুপুরী কর্তৃক মাইজভাণ্ডারী তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে বর্তমানে দরবারে তরিকার কার্যক্রম পরিচালিত হয় না।

গোমদন্ডী আহমাদিয়া হক দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় সৈয়দ আহমেদ শাহ হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক মাইজভাণ্ডারী তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দরবার।

এয়াকুব ভাণ্ডার দরবার শরীফ: পটিয়ার হুলাইনস্থ দরবারটি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর খলিফা হাফেজ ইয়াকুব আলী শাহ আল মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৈয়দ ভাণ্ডার দরবার শরীফ: পটিয়ার নলান্ধায় অবস্থিত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর খলিফা মাওলানা আবু সৈয়দ শাহ মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দরবার।

গোমদন্ডী হোসেন ভাণ্ডার দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় সৈয়দ আবুল হোসেন মিয়াজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দরবার।

সুলতান ভাণ্ডার দরবার শরীফ: কর্ণফুলী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ছৈয়দ সুলতান আহমদ প্রকাশ শাহ সুলতানুল আউলিয়া আল কাদেরী আল মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯৫৮ খ্রি.), সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

ফতেপুর দরবার শরীফ: হাটহাজারী উপজেলা অবস্থিত শাহসূফী মওলানা সৈয়দ বাচা মিঞা শাহ ফতেপুরী (১৮৫৫-১৯৪৯ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তার মূল নাম হলো- সৈয়দ আমিনুল ইসলাম এবং 'বাচা মিঞা' নামটি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর দেয়া উপাধি। খেলাফত পাওয়ার দুইদিন পর তিনি পীরের নির্দেশে বার্মায় দুই বছর অবস্থান করে তরিকতের প্রচার প্রসার ঘটান।

খলিল ভান্ডার দরবার শরীফ: রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাওলানা খলিলুর রহমান শাহ মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯২১/২২ খ্রি.) কর্তৃক তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর ৮ম খলিফা।

মজু ভান্ডার দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলার খিতাপচর গ্রামে হযরত শাহসূফি মোজাহেরুল হক শাহ প্রকাশ মজু শাহ (১৯১০- ২০০৫ খ্রি.) কর্তৃক মাইজভাণ্ডারী তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুফি মজু শাহ, আমির ভান্ডারের হযরত সোলাইমান শাহ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

বরকল বদি ভান্ডার দরবার শরীফ: চন্দনাইশ উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি মাওলানা সৈয়দ বদিউল আলম শাহ সুলতানপুরী মাইজভাণ্ডারী (ইন্তেকাল ১৯৬৯/৭০ খ্রি.) কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মাইজভাণ্ডার তরিকাভুক্ত সাতগাছিয়া দরবারের সুলতানপুরী পীর সাহেব থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত।

মতিভান্ডার দরবার শরীফ: ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট গ্রামে হযরত মতিয়র রহমান শাহ্ (ক.) ফরহাদাবাদী (১৮৯৮- ১৯৬৪ খ্রি.) কর্তৃক মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী থেকে বেলায়তের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ও সমসাময়িক আউলিয়াগ তাঁকে মাইজভাণ্ডার শরীফের 'যুবরাজ' বলে সম্মোধন করতেন।

২.৩. নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকা

পূর্বে (১.৩.গ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, নকশবন্দিয়া তরিকা ভারতীয় উপমহাদেশে এসে কিভাবে মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকা মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ সিরহিন্দীর (১৫৬৪-১৬২৪ খ্রি.) সময়কালেই তা বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। দাবি করা হয়, শেখ আহমদ সিরহিন্দীর প্রায় পাঁচ হাজার খলিফা ছিলেন, তবে ২২ জন বিশেষ মহান খলিফার নাম বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই খলিফাদের মাধ্যমে উপমহাদেশের আনাচে কানাচে তরিকার নাম ও কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আগমন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মত নেই। তবে তরিকার সুফিদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলায় বিশেষত চট্টগ্রামে মুজাদ্দেদিয়া তরিকার আগমন ও প্রচার প্রসার ঘটে বালাকোটের বীর সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) এর খলিফাদের মাধ্যমে।[57] তিনি শেখ আহমদ সিরহিন্দীর ৫ম অধস্তন পুরুষ ও মাওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী থেকে খেলাফত প্রাপ্ত। সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর মাধ্যমে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় 'তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া' নামে নতুন সিলসিলার আবির্ভূত হয়েছে। তিনি, তাঁর পীর আবদুল আযীয দেহলভীর স্বপ্ন/আদেশ অনুযায়ী ভারত-বাংলা একটি অখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জিহাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে বালোকোটে শিখদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ১৮৩১ সালে তাতে শহীদ হন। চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য সুফি-সাধক সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে বায়াত গ্রহণ করে জিহাদী আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূলত বালাকোট যুদ্ধের আগে ও পরের সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের মুরিদ ও খলিফাদের দ্বারা বাংলায় 'সিলসিলা-এ মুহাম্মদিয়া মুজাদ্দেদিয়া' প্রসিদ্ধি ও ব্যাপ্তি লাভ করেন। এসব খলিফাদের মধ্যে-চট্টগ্রামের সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী, মাওলানা আবদুল হাকিম বাঙ্গালী, মাওলানা শাহ কারামাত আলী জৈনপুরী অন্যতম। চট্টগ্রাম মীরসরাইয়ের সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর মাধ্যমেই চট্টগ্রামে তরিকার প্রচার-প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে গাজীয়ে বালাকোট সুফি নিজামপুরীর প্রধান খলিফা ফতেহ আলী ওয়াইসী, শাহ আহমদুল্লাহ, খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ খান (র.), হামেদ হাসান আলভী আযমগড়ীর মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া

[57] ডঃ মো. ইবরাহীম খলিল, সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাঁদের অবদান, পৃষ্ঠা ৩২১

ছড়িয়ে পড়ে।[58] উল্লেখ্য যে, প্রধান খলিফা ফতেহ আলী ওয়াইসীর ৩৯ জন খলিফা ও হামেদ হাসান আলভী আযমগড়ীর প্রায় ৪৪ জন খলিফা ছিলেন।

হযরত হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর ৩৯ জন খলিফার মধ্যে ১৫ জনই চট্টগ্রামের। তাঁরা হলেন- চুনতির শাহ মাওলানা নজির আহমদ (ইন্তেকাল ১৯৪৪ খ্রি.), হালিশহরের হাফেজ ছৈয়দ মুনিরুদ্দীন নুরুল্লাহ (ইন্তেকাল ১৯৫৪ খ্রি.), বোয়ালখালীর মাওলানা আবদুল জব্বার, বাঁশখালীর মাওলানা খলিল আহমদ/খলিলুর রহমান, চুনতির মাওলানা ফজলুল হক, সাতকানিয়ার মাওলানা ফজলুর রহমান, আনোয়ারা জুঁইদন্ডীর মাওলানা শরফুদ্দীন চিশতি, কুতুবদিয়ার মাওলানা জামাল উদ্দীন, চুনতির হাকিম মাওলানা কাজী মুনির আহমদ, গারাংগিয়ার মাওলানা আবদুল মজিদ, গারাংগিয়ার মাওলানা আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, সাতকানিয়ার মাওলানা আবদুল মাবুদ, দোহাজারীর মাওলানা আবদুল হাকিম, সাতকানিয়ার মাওলানা আকামুদ্দীন, লোহাগড়ার মাওলানা অজীহুল্লাহ।

নিম্নে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত হাল আমলের প্রধান দরবারসমূহের আবির্ভাব ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

ধর্মপুর দরবার শরীফ: এটি সাতকানিয়া উপজেলায় অবস্থিত কাজী সৈয়দ মুহাম্মদ ইসলাম শাহ চাটগামী (রহ:) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত দরবার। সৈয়দ ইসলাম শাহ চাটগামী ১৯৫৫ সালে খুলনার হযরত আবদুল আযীয খুলনবীর হাত ধরে তরিকতে দাখিল হন। পীর আবদুল আযীয খুলনবীর সিলসিলাটি একাধারে সাতটি তরিকা সংযুক্তি পাওয়া যায়। তা হলো: নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরিয়া, কলন্দারিয়া, মুদারিয়া, কোবরাভীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া। প্রতিটি সিলসিলা খুলনবীর দশমতম উর্দ্ধতনে গিয়ে মোজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমেদ ফারুক সিরহিন্দির সাথে মিলিত হয়। সৈয়দ ইসলাম শাহ চাটগামীর অধস্তনদের দ্বারা এখনো দরবার ও তরিকতের কার্যক্রম চলমান।

গারাংগিয়া দরবার শরীফ: সাতকানিয়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি হামেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। হামেদিয়া সিলসিলা শাহ হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর কর্তৃক প্রবর্তিত, যিনি সৈয়দ আবদুল বারী ওয়াইসী কর্তৃক একাধারে সাতটি তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত হন। এই সিলসিলা সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বালাকোটী হয়ে শায়খ আহমদ ফারুক সিরহিন্দীর সাথে মিলিত হয়। হামেদ আযমগড়ী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে হযরত আবদুল মজিদ বড় হুজুর (ইন্তেকাল ১৮৯৪ খ্রি.) গারাংগিয়া দরবার প্রতিষ্ঠা করেন।[59] সাতটি সিলসিলার সাথে সংযুক্তি থাকলেও দরবারটি বর্তমানে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসরণ করে থাকে।

হালিশহর দরবার শরীফ: চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত দরবারটি নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আজমগড়ী সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিন নুরুল্লাহ (ইন্তেকাল ১৯৫৪ খ্রি.) ছাত্রজীবনে গারাংগিয়া বড় হুজুরের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সরাসরি হাফেজ হামেদ হাছান আলভী আজমগড়ী (ইন্তেকাল ১৯৫৯ খ্রি.) এর সাক্ষাতে বায়াত ও খেলাফতপ্রাপ্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই আযমগড়ীর সিলসিলা প্রচার প্রসারে গারাংগিয়া দরবারের বড় হুজুরের পাশাপাশি, হাফেজ মুনির উদ্দিন কেবলা ব্যাপক ভূমিকা

---

[58] ডঃ মুহম্মদ শেহাবুল হুদা (দ্যা সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস অব চিটাগাং) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর অনুবাদ, শাহাব উদ্দীন নীপু, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪৬, ১৫৩ ; রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সূফীসাধক, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪

[59] আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, কুতুবুল আলম সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ (রহঃ) হযরত বড় হুজুর (রহঃ) গারাংগিয়া, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫-৪৮।

রয়েছে। হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিন নুরুল্লাহ থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামে কুতুবদিয়া, বড়লিয়া দরবারদ্বয়সহ বেশ কিছু সংখ্যক দরবার এখনো ব্যাপক আকারে তরিকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কুতুব দরবার শরীফ: কক্সবাজারের কুতুবদিয়া থানায় অবস্থিত দরবারটি ১৯৬০ সালে আবদুল মালেক আল-কুতুবী (ইন্তেকাল ২০০২ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'কুতুবদিয়ার মালেক শাহ' নামে অধিক পরিচিত। তিনি হাফেজ হামেদ হাছান আলভী আজমগড়ী রহ. এর নির্দেশক্রমে কাদেরীয়া সিলসিলার পীর হাফেজ ছৈয়দ মুনির উদ্দীন নুরুল্লাহ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে খেলাফতপ্রাপ্ত হন।[60] খেলাফতপ্রাপ্তির পর শুরুর দিকে কয়েকজনকে তরিকতের সবক দিয়েছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁদের পুনরায় সবক দেয়া হতে বিরত থাকেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি পীরতান্ত্রিক জীবনের বিপরীতে একাকিত্ব ও সাধনার জীবন বেছে নেন। তাই দরবারটিতে বর্তমানে তরিকার কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। তবুও চট্টগ্রামসহ গ্রাম বাংলার মানুষ এখনো দরবারে নিয়মিত যাতায়াত করেন, এর দরুন সূচনালগ্ন থেকেই বর্তমান পর্যন্ত লঙ্গরখানার প্রচলন রয়েছে। ১৯৬০ সালে কুতুব শরীফ দরবার প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সময়ে চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লায় কুরবান আলী সওদাগরের বিল্ডিংয়ে ও মাঝিরঘাট শফিক আহমদ সওদাগরের বাড়িতে তিনি আধ্যাত্মিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

বড়লিয়া সালামিয়া দরবার শরীফ: পটিয়া উপজেলার বড়লিয়ায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ আবদুচ্ছালাম আউলিয়া (ইন্তেকাল ১৯৩০ খ্রি.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রথমে ভারতের মাওলানা ছৈয়দ আবদুস সামি নদভীর নিকট তরিকা গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়ার তরিকার পীর মাওলানা ছৈয়দ শাহ আবদুল হাকিম হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফতপ্রাপ্ত হন, যার ধারা এখনো বহমান। তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে শাহজালাল ইয়ামেনীর সঙ্গী সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন ও মহাকবি ছৈয়দ শাহ সুলতান অন্যতম, যা সরাসরি হযরত আলীর সাথে মিলিত হয়। তৎকালীন সময়ে গ্রামবাসী তাঁর পরিচয় জানতে পারলে তাঁকে 'বড় আউলিয়া' নামে অ্যাখ্যা দেন, যার অনুসারে পরবর্তীতে গ্রামের নাম 'বড়লিয়া' হয়।

বড়লিয়া রাহমানিয়া দরবার শরীফ: পটিয়ার বড়লিয়ায় অবস্থিত দরবারটি মৌলানা মাহবুবুর রহমান শাহ (ইন্তেকাল ২০০৪ খ্রি.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভারতে থাকাকালীন হাফেজ হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ীর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। পরে দীর্ঘ সাধনার পর খেলাফত প্রদান করে তাঁকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। মৌলানা মাহবুবুর রহমান শাহের বংশপরম্পরা ও বড়লিয়া সালামিয়া দরবারের পীর আবদুচ্ছালাম আউলিয়ার বংশপরম্পরা অভিন্ন।

ফৌজদারহাট দরবার শরীফ: চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে অবস্থিত দরবারটি হযরত আল্লামা শাহ সফিরুর রহমান আল হাশেমী নকশবন্দী মোজাদ্দেদী (ইন্তেকাল ১৯৫৪ খ্রি.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। শাহ সফিরুর রহমান নকশবন্দী মোজাদ্দেদী স্বপ্নযোগে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সাক্ষাতের পর রামপুরের হাফেজ ইনায়তুল্লাহ খাঁন রামপুরী (ইন্তেকাল ১৯২৬ খ্রি.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন বছর সাধনার পর নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৩২ সালে কাপড়ের ব্যবসা ও হেকমি চিকিৎসার পাশাপাশি আন্দরকিল্লা মসজিদের এক কক্ষে 'খানকায়ে সফিরিয়া মোজাদ্দেদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আটজন খলিফা ছিলেন যাঁদের মাধ্যমে তরিকাটি ব্যাপকতা লাভ করে।

---

[60] শিব প্রসাদ শূর, প্রাগুক্ত, ১২৪-২৫

জোহাদীয়া দরবার শরীফ ও হাবিবিয়া দরবার শরীফ: চন্দনাইশের কাঞ্চননগরে অবস্থিত দরবারটি মাওলানা আবু মোহাম্মদ জোহাদুর রহীম নকশবন্দী মোজাদ্দেদী (ইন্তেকাল ১৯৭৯ খ্রি.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ফৌজদারহাট দরবারের পীর হযরত আল্লামা শাহ সফিরুর রহমান আল হাশেমী নকশবন্দী মোজাদ্দেদী (ইন্তেকাল ১৯৫৪ খ্রি.) এর অন্যতম খলিফা। পারিবারিকভাবে তিনি কাদেরিয়া তরিকার হলেও তিনি একমাত্র খলিফা, যিনি কাদেরিয়া তরিকা মূলতবী করে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসরণ করেন। তাঁর ভাই মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান শাহ, তরিকাতে কাদেরিয়া আলিয়া অনুসরণ করে থাকেন। হাবিবুর রহমান শাহের দরবারটি 'হাবিবিয়া দরবার শরীফ' নামে পরিচিত। দরবারদ্বয় একই স্থানে এবং স্ব স্ব তরিকা প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন।

খায়ের মঞ্জিল দরবার শরিফ ও নেয়ামত মঞ্জিল দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সুফি মৌলভী আবুল খায়ের নকশবন্দি (ইন্তেকাল ১৯৭৩ খ্রি.) ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। আবুল খায়ের নকশবন্দি ছিলেন সহস্রাধিক গানের রচিয়তা। লিখেছেন- অগ্নিশিখা, প্রেম লহরী, নুর লহরী, ভক্তি মালা, ভাবের বাঁশি ইত্যাদি গ্রন্থাদি। শিক্ষিত জাতি গঠনে তাঁর সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। তিনি পশ্চিম গোমদন্ডি বহদ্দারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গোমদন্ডী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। আবুল খায়ের নকশবন্দির জীবদ্দশায় তরিকার প্রচার প্রসারে ঈসা আহমদ নকশবন্দিসহ অনেক সুফি-সাধককে খেলাফত দিলেও ওফাতের পর থেকে বর্তমানে তরিকার কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তাঁকে বোয়ালখালীর বহদ্দারপাড়ায় দাফন করা হলেও আনোয়ারায় "নেয়ামত মঞ্জিল দরবার শরীফ" নামে একটি আস্তানা রয়েছে।

রাহাতিয়া দরবার শরীফ: রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত দরবারটি মাওলানা শাহ্ রাহাতুল্লাহ নকশবন্দি কর্তৃক দরবারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আবদুল হক মোহাজেরে মক্কির হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি একাধারে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, ও সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী হতে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকায় খেলাফতপ্রাপ্ত। তবে তিনি নকশবন্দিয়া তরিকায় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুচ্ছাফা নঈমী এবং সৈয়দ মুহাম্মদ খাইরুল বশর নঈমী অন্যতম।

মীরসরাই লতিফিয়া দরবার শরীফ: মীরসরাই উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি আল্লামা শাহ আবদুল লতিফ (রহ:) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লামা শাহ আবদুল লতিফ, হযরত মাওলানা আকরাম আলী থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। হযরত মাওলানা আকরাম আলী মীরসরাইয়ের গাজীয়ে বালাকোট সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর খলিফা ছিলেন।

সারোয়াতলী আল হক দরবার শরীফ: বোয়ালখালী উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ আবদুল হালিম শাহ (ইন্তেকাল ২০০২ খ্রি.) কর্তৃক নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি হালিশহরের পীর হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিন শাহ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত। তিনি খুব কম সংখ্যক মানুষকে বায়াত করাতেন। কেউ বায়াত গ্রহণের ইচ্ছে পোষণ করলে বারংবার যাচাই-বাছাই করে তরিকায় দাখিল করতেন। বর্তমানে তাঁর বংশধর ও খলিফা দ্বারা তরিকতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রাঙ্গামাটিয়া মীর মুনিরিয়া দরবার শরীফ: ফটিকছড়ি উপজেলার অবস্থিত দরবারটি সৈয়্যদ মীর আহমদ মুনিরী (ইন্তেকাল ১৯৭৮ খ্রি.) নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বারিয়া মুনিরিয়া আজমগড়ী সিলসিলার উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ২১

বছর বয়সে হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী'র নির্দেশক্রমে হালিশহরের পীর হাফেজ সৈয়দ মুনির উদ্দিনের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ফটিকছড়িতে তরিকা প্রচারে ব্রত হন।

২.৪. চিশতিয়া তরিকা

পূর্বে (১.৩.ক অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে খাজা মুইনউদ্দীন চিশতীর চিশতিয়া তরিকার মাধ্যমে আগমন ঘটে। পরবর্তীতে খলিফা খাজা কুতুবউদ্দিন কাকী, এর খলিফা খাজা শেখ ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর, এবং এর প্রধান খলিফা সুলতান নিজামুদ্দীন আউলিয়াদের মাধ্যমে চিশতিয়া তরিকার সর্বাধিক ব্যাপকতা লাভ করে। সুলতান নিজামুদ্দীন আউলিয়ার খলিফার সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত এবং এর মধ্যে অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন আয়নায়ে হিন্দুস্তান শেখ আঁখি সিরাজুদ্দীন ওসমান (১২৫৮-১৩৫৭ খ্রি.)।[61] এই শেখ আঁখি সিরাজ'র মাধ্যমে বাংলায় সর্বপ্রথম চিশতিয়া তরিকার আবির্ভাব ঘটে।[62] এর পরপরই চিশতিয়া তরিকার অসংখ্য সুফি-সাধক বাংলায় আগমন করেন। অন্যদিকে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুফিরা রয়েছে, যারা বাংলা থেকে ভারতবর্ষে গমন করে চিশতিয়া তরিকায় দীক্ষিত হয়েছেন। অনেকেই দাবি করেন, বাংলাদেশের চিশতিয়া তরিকা যার মাধ্যমে সবার্ধিক প্রশস্ত হয়েছে মানিকগঞ্জের হযরত মাহবুবে খোদা দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি নিজাম (১৮৩০- ১৯১৯ খ্রি.) এর মাধ্যমে। ওনার প্রধানতম খলিফা ছিলেন হযরত মুনসুর শাহ চিশতি (১৮৭১- ১৯৮৫ খ্রি.) যার মাধ্যমে চিশতিয়া তরিকার ২৫ জন খলিফা তৈরি হয়। তবে চট্টগ্রামে চিশতিয়া তরিকার প্রথম আগমন নিয়ে তথ্য ঘাটতির কারণে সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

নিম্নে চিশতিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত হাল আমলের প্রধান দরবারসমূহের আবির্ভাব ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

ওষখাইন আলী নগর দরবার শরীফ: আনোয়ারার ওষখাইনে অবস্থিত দরবারটি অষ্টাদশ শতকের কবি ও সুফি আলী রজা প্রকাশ কানু শাহ (ইন্তেকাল) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হযরত আলী রজা কানু শাহ চারটি তরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। শহর কুতুব শাহ আমানতের খলিফা শাহ সুফি কেয়ামুদ্দীন আউলিয়া থেকে তরিকায়ে চিশতিয়া ও তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া এবং সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আহমদ'র নিকট হতে কাদেরীয়া নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার খেলাফত লাভ করেন। কানু শাহ'র লিখিত গ্রন্থের মধ্যে– জ্ঞানসাগর, শাহনামা, সিরাজ কুলুব, ধ্যানমালা, রাগ তালনামা অন্যতম। তাঁর খলিফা সংখ্যা ৩০০ জনের অধিক। ওষখাইনীরি নূরীয়া বিষু দরবার শরীফসহ চট্টগ্রামে অনেক উপ-শাখা রয়েছে। চার তরিকার সিলসিলাপ্রাপ্ত সত্ত্বেও সূচনালগ্ন থেকেই দরবারটি চিশতিয়া তরিকার অনুসারী।

দক্ষিণ শুকছড়ি চিশতিয়া দরবার শরীফ: লোহাগাড়া উপজেলায় অবস্থিত দরবারটি সৈয়দ আবদুল খালেক শাহ ওরফে শাহ জুলফক্বার সুফি (ইন্তেকাল ১৯২৩ খ্রি.) কর্তৃক চিশতিয়া-নেজামিয়া তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবারটির ইতিহাস বেশ পুরনো। আবদুল খালেক শাহের পূর্বপুরুষ সৈয়দ আমির বুরহান উদ্দিন ভারত হয়ে বাংলায় আগমন করেন। যিনি শাহজালালের সঙ্গী ও ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম প্রচারে ব্রত থাকলে তৎকালীন শাসকের অনুরোধে দক্ষিণ শুকছড়ি আসেন এবং এখানে বসতি স্থাপন করেন। এই সৈয়দ আমির উদ্দীনের পৌত্র হলেন সৈয়দ আবদুল খালেক শাহ জুলফিক্কার সুফি। তিনি পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কলকাতা আলিয়ায় গমন করলে সেখানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের দিকে মনোযোগী হন। ফলে শুরুতে কাদেরিয়া তরিকার খলিফা আবদুল হামিদ বোগদাদির নিকট বায়াত গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বারবাঙ্কি দরবার শরীফের পীর হযরত আকদছ কুলহুআল্লাহ'র নিকট চিশতিয়া তরিকায় দীক্ষিত ও খেলাফতপ্রাপ্ত হন। পুনরায় তিনি শুকছড়িতে আগমন করে চিশতিয়া-নেজামিয়া সিলসিলায় তরিকা ও সাধন-কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

---

[61] মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফি (২য় খন্ড), কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, পৃষ্ঠা ৫

[62] তারিখে ফারিশতা: মুহাম্মদ কাসিম, ৪র্থ খন্ড, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৭৭৬

২.৫. সোহরাওয়ার্দী তরিকা

বাংলাদেশ বিশেষত চট্টগ্রামে সোহরাওয়ার্দী তরিকার সর্বপ্রথম আগমন ঘটে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (১২৭১ – ১৩৪১ খ্রি.) এর মাধ্যমে।[63] তিনি মক্কা থেকে মুলতান, দিল্লি হয়ে চট্টগ্রাম আসেন।[64] পরবর্তী চট্টগ্রামে দিনকয়েক অবস্থান করে সিলেটের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। এসময় শাহজালাল ইয়ামেনির কয়েকজন সঙ্গী চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি শৈশব থেকে প্রায় ২২ বছর পর্যন্ত মামা হযরত সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দীর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে আবু সাঈদ তাবরিজী এঁর নিকট মুরীদ হয়ে দুই বছর, সোহরাওয়ার্দী তরিকার ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুরীদ হয়ে সাত বছর ও হযরত বাহাউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নিকট পঁচিশ বছর খেদমত ও তরিকত চর্চা করেন। পরবর্তীতে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এবং পীরের অনুমতিক্রমে বাংলার সিলেটে আগমন করে। ইতিহাসবেত্তাদের দাবি, ভারতীয় উপমহাদেশে খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতির পর শাহজালাল ইয়ামেনীই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন। বাংলাদেশে তাঁর সিলসিলা 'জালালিয়া' নামে পরিচিত। শাহজালাল ইয়ামেনীর সঙ্গীদের মধ্যে যারা চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন, তাদের দ্বারা সোহরাওয়ার্দী তরিকা অনুসরণ করা হলেও বর্তমানে চট্টগ্রামে এর কোনো উপস্থিতি ও কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় নয়।

২.৬. অন্যান্য তরিকাসমূহ

উপরোক্ত তরিকা ছাড়াও চট্টগ্রামে আরো একাধিক তরিকার সুফি-সাধকের আগমন ঘটেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো চট্টগ্রামের মাটিতে শায়িত আছেন। আবার কেউ কেউ চট্টগ্রামে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় ফিরে যান। তবে বর্তমানে চট্টগ্রামে তাঁদের প্রচারিত তরিকার কোনো উপস্থিতি ও কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় নয়।

ক. মাদারিয়া তরিকা: কুতুব-উল-মাদার সৈয়দ বদিউদ্দিন আহমেদ জিন্দা শাহ মাদার (৮৫৭-১৪৩৪ খ্রি.) এই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ:) থেকে প্রবর্তিত "তায়ফুরিয়া" তরিকায় খেলাফতপ্রাপ্ত হন। এই তায়ফুরিয়া তরিকা থেকে পরবর্তীতে মাদারিয়া তরিকার উৎপত্তি হয়।[65] সৈয়দ বদিউদ্দীন জিন্দা শাহ মাদার (রহ.) এর প্রায় সোয়া লক্ষ খলিফা ছিলেন। তার মধ্যে, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহ, শাহ অপূর্ব মীর চিশতী আল খিজিরী অন্যতম। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শাহ মাদার এর সম্মানে তাঁর নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা, সড়ক, গ্রাম, জেলা, অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। চট্টগ্রামের মধ্যে মাদারবাড়ি, দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন, উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন অন্যতম। আধুনিক পণ্ডিতরা ধারণা করেন, সৈয়দ বদিউদ্দীন জিন্দা শাহ মাদার (রহ.) বাংলাদেশে এসেছিলেন।[66] মাদারিয়া তরিকা 'ফানা ফিল ফানা' বিশ্বাস করতেন না, বরং আল্লাহর একত্বের উপর অধিক জোর দিতেন। **মাদার গান** বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য সৃষ্টি। মাদার গানের মূল উপজীব্য হলো, শাহ মাদার নামক পীরের গুণগান।[67]

খ. কলন্দরিয়া তরিকা: কলন্দরিয়া তরিকা, চিশতিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত একটি তরিকা। শেখ শরফুদ্দিন বু আলী কালান্দার পানিপথী (১২০৯-১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি সোহরাওয়ার্দিয়া, কাদেরিয়া এবং নকশাবন্দিয়া তরিকারও খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি কোনো এক সময় চট্টগ্রাম এসেছিলেন, নিদর্শনস্বরূপ বোয়ালখালী উপজেলার কড়লডেঙ্গায় ও শহরের সুগন্ধা আবাসিকে তাঁর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। তাঁর নামানুসারে 'বোয়ালখালী'

---

[63] ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, ১৪৮-৫৪। আলী মাহমুদ খান, প্রাচ্যসূর্য হযরত শাহজালাল (রহ.), ১৯৮৪, আল-জালাল প্রিন্টার্স, দরগাহ গেইট, সিলেট, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬

[64] প্রাগুক্ত

[65] ডঃ আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০

[66] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১

[67] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২

‘বোয়ালিয়া’ নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কলন্দরিয়া তরিকার সুফি-সাধকদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কলন্দরিয়ারা সাধারণত ফকীরের বেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। এদের নির্দিষ্ট কোনও আবাসস্থল ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার ঘরে ঘরে কলন্দরীয়া সুফি সাধকদের কথা শোনা যেতো।[68] সে সময় উত্তর ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক কলন্দর সুফি সাধক বাংলা ও চট্টগ্রামে আগমন করেন। তৎকালে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকলের ঘরে ঘরে কলন্দরী সুফি দরবেশদের নাম উচ্চারিত হতো। উদাহারণস্বরূপ মুকুন্দরাম করি কঙ্কনের লেখা চণ্ডী কাব্যে (রচনাকাল ১৫৮৪ খ্রিঃ) বলা হয়েছে: ‘কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাত্রি’।[69] কলন্দর তরিকার ফকিরগণ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতো।

এছাড়া শাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত সাত্তারিয়া তরিকা, আদহামিয়া, কুবরাইয়া তরিকার আগমনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরোক্ত দরবারসমূহ ছাড়াও চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে আরো অসংখ্য দরবার/দরগাহ/মাজার শরীফ দেখতে পাওয়া। যেগুলোর কিছু দরবার বা মাজারে এখনো তরিকার কার্যক্রম চলমান। তবে বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে তরিকার কার্যক্রম চলমান নেই এমন দরগাহ/মাজারই সবচেয়ে বেশি। উপরোক্ত আলোচনা বর্তমানে তরিকার কার্যক্রম চলমান এমন দরবারসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেক স্থানীয়রা মনে করেন, চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দরবার ব্যতীত অত্যন্ত গোপনে তরিকার কার্যক্রম এখনো পরিচালনা হয়ে থাকে।

[68] শিব প্রসাদ শূর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪

[69] মাহমুদা খানম, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সূফী কাব্যের প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯৮

তৃতীয় অধ্যায়: চট্টগ্রামের জনসমাজে সুফি-প্রভাব ও হাল আমল

হাল আমলে, যখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আধুনিকতা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনও সুফিদের খানকাহ, মাজার, দরবার ও উৎসবমালা যেন চূড়ান্ত যৌবনে। আকৃষ্ট করে চলেছে লক্ষ-কোটি মানুষকে, আঞ্চলিক সীমানা উতরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। এই প্রভাব শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসমাজে সুফিদের প্রভাব একটি ঐতিহাসিক ও সমকালীন ঘটনা। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাহিত্যে তা নানামাত্রায় বিস্তৃত। এই অংশে আমরা চট্টগ্রামের সুফি-সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি এবং এগুলোর মাধ্যমে জনসমাজে সৃষ্ট প্রভাবকে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করবো। সবশেষে, চট্টগ্রামের জনসমাজে সুফি-প্রভাব নিয়ে অতীতের করা একটি মাঠপর্যায়ের জরিপ ও পর্যবেক্ষণ বোঝার চেষ্টা করবো।

৩.১ ধর্মীয় প্রভাব

সুফিবাদ (Sufism বা তাসাউফ) ইসলামের আধ্যাত্মিক বা মরমী রূপ। পূর্বেও (১.১ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, সুফিবাদের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো শরিয়ত এবং শরিয়ত পালন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, চাই তিনি সাধারণ মুসলমান হোন বা সুফি-সাধক। কিন্তু সুফিরা শরিয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণের পর পরমাত্মার নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে আত্মশুদ্ধি (তাজকিয়া), ঐশ্বরিক প্রেম (ইশক) ও আধ্যাত্মিক দিকে জোর দেয়। ফলে তাঁকে পাড়ি দিতে হয় তরিকত, মারেফত ও হাকিকত নামীয় জীবন-পদ্ধতির কঠিনতম পথ। সুফিরা পরম সত্য (হাকিকত) ও অন্তর্ধান (ফানা) এর মাধ্যমে পরমাত্মার নৈকট্য লাভের সর্বদা সচেষ্ট থাকলেও তাঁরা শরিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের প্রতি যথেষ্ট তাগিদ দেন। তার অনুরূপ চট্টগ্রামের প্রায় সকল তরিকা ও সুফি-সাধকগণ তাদের অনুসারীদের (মুরিদ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা এবং ইমান বৃদ্ধির স্ব স্ব তরিকার বিশেষ কিছু আমল পালনে সর্বোচ্চ তাগাদা দেন। যেমন: কাদেরিয়া সিলসিলায় একজন সাধককে বায়াত গ্রহণের পর সবক দিয়ে থাকেন– ফজরের নামাজের পর (দরুদ শরীফ - ১০০ বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ, ইল্লাল্লা-হ, আল্লাহু ২০০ বার) মাগরিবের নামাজের পর সালাতুল আউওয়াবীন আদায় এবং ইশার নামাজের পর (বিসমিল্লাহ সহকারে কালেমা তাইয়্যেবা ১০০ বার)[70], যা একজন সাধক প্রতিদিন পালন করতে বাধ্য। সাথে নির্দেশ দেন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার। এভাবে মাইজভাণ্ডারীয়া, চিশতিয়া, মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলায় রয়েছে তাদের নিজস্ব সবক। নিয়মিত ধর্মীয় কার্যক্রম পালনের পাশাপাশি বিশেষ লক্ষ্যে চট্টগ্রামের সুফি-সমাজের অনুসারী, ভক্তবৃন্দ 'খতমে কুরআন', 'খতমে বুখারী শরীফ', 'খতমে গাউসিয়া', 'খতমে খাজেগান', 'খতমে শেফা', 'খতমে ইউনুস' 'মিলাদ-কিয়াম' সহ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করে থাকেন। আবার তা পালনের ক্ষেত্রে রয়েছে আপন আপন তরিকার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। যেমন- মিলাদ-কিয়ামে "মোস্তফা জানে রাহমত পে লাখো সালাম" পাঠের সময় ও খতমে গাউসিয়ায় শাজরা পাঠের সময় আপন মুর্শিদ ও তাঁর সিলসিলার পূর্বপুরুষদের বিশেষভাবে স্মরণ করা। আবার দরুদ পাঠের ক্ষেত্রেও তরিকাভেদে ভিন্নতা দেখা যায়।

তরিকা অনুসারে কার্যক্রম, আচার, কৃষ্টিতে ব্যবধান, ভিন্নতা স্বত্ত্বেও সাম্য, ইনসাফ, উদারতা বিশেষত ধর্মীয় সহনশীলতার প্রশ্নে সকল তরিকা, সকল সুফি-সাধক এক ও অভিন্ন। সুফিরা নিজ ধর্মের, নিজ ভাইয়ের উগ্রবাদ, কট্টরপন্থার বিপরীতেও ছড়িয়েছেন প্রেম, সমতা ও মানবতার বাণী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আতিথেয়তার ব্যাপারেও তাঁরা সদা তৎপর ছিলেন। চট্টগ্রামের এমন অসংখ্য দরবার দেখতে পাওয়া যায়, ন্যূনতম সংঘাত সহিংসতা ছাড়াই যুগ যুগ ধরে মন্দির, গির্জা, দরবার পাশাপাশি অবস্থান করে নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করে যাচ্ছে। কড়লডেঙ্গার বু আলী শাহ কলন্দরের আস্তানা,

[70] শাজরা শরীফ, সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া, পাকিস্তান, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১০

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানা, আল আমিন বারিয়া দরবার শরীফসহ অসংখ্য দরগাহ-খানকাহ তাঁর নিদর্শন। সুফি-সাধকদের ওরশে, দরবারের বিভিন্ন কার্যক্রমেও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই আমন্ত্রণ করা হয়। যার দরুন অতীতের ধারাবাহিকতায় সুফি-সাধকদের মাধ্যমে এখনো প্রতিনিয়ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

৩.২ সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সমাজসেবায় সুফি-প্রভাব

সুফি দর্শনে ধর্মীয় চর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে জনসেবা (খিদমত-এ খালক), সমাজকল্যাণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁরা বিশ্বাস করেন, "মানুষের সেবা করাই আল্লাহর সেবা"। শেখ সাদী (রহ) এক কবিতায় বলেন, " طریقت به جز خدمت خلق نیست - به تسبیح و سجاده و دلق نیست" (তরিকতের মূল পথ/কথাই মানবসেবা করা – তসবিহ, সিজদা বা দরবেশি পোশাকেই তা সীমাবদ্ধ নয়)।[71] সুফিরা খানকাহ (সাধনাকেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করে শুধু যিকর-সামা চালাননি, বরং সেগুলোকে সমাজসেবার আঁতুড়ঘর বানিয়েছেন। যেখানে দরিদ্র, পথিক, অনাথ, ছাত্র সবাই বিনামূল্যে খাবার (লঙ্গরখানা), আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বাংলায় (বিশেষত চট্টগ্রামে) সুফিরা বন কেটে গ্রাম/শহর গড়েছেন, অবকাঠামো তৈরি করেছেন এবং নিম্নবর্গের মানুষকে সমতার বার্তা দিয়ে সমাজ গঠন করেছেন।

চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই সুফিদের পদচারণা রয়েছে, সাথে সমাজকল্যাণ ও মানবসেবার অসংখ্য ইতিহাসও। তৎকালীন প্রায় সকল সুফি সাধকদের আস্তানা/খানকায় লঙ্গরখানার প্রচলন ছিল।[72] লঙ্গরখানা বলতে বোঝায় যেখানে দরিদ্র, অভুক্ত বা সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হয়। লঙ্গরখানা সুফি ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চট্টগ্রামে সীতাকুন্ডের মাওলানা শাহ সাহেব'র একটি বিখ্যাত লঙ্গরখানা ছিল। তাতে তিনি প্রতিদিন প্রায় শতাধিক অনাথ দরিদ্রদের খাবার দিতেন এবং তিনি বিড়াল কুকুরদের জন্যও খাবার ব্যবস্থা করতেন। হাল আমলে হযরত আমানত শাহ'র মাজার, কুতুবদিয়া দরবার শরীফ, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে লঙ্গরখানার প্রচলন রয়েছে। কুতুবদিয়ায় প্রতিদিন প্রায় ২০০-৩০০ জন লোক দূর দূরান্ত থেকে দরবারে জিয়ারত করতে আসেন। এখনো প্রায় সকল দরবারে রমজানে মাসব্যাপী ইফতার এবং দরবারে অবস্থানকারীদের জন্য সেহরির ব্যবস্থা করে থাকেন। সুফিরা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সমাজ গঠনেও সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চট্টগ্রামেও এমন অনেক দরবার রয়েছে, যারা দরবারে মানুষের দানকৃত টাকা দিয়ে কখনো সাধকদের সংগঠিত রূপে বা কখনো ব্যাক্তিগত উদ্যোগে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অভুক্তদের আহার করানো, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ, অনাথ এতিম শিশুদের শিক্ষা সহায়তা, উপার্জন সামগ্রী বিতরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দুর্যোগ দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম, লাশ উদ্ধার– হোক অগ্নিকাণ্ডে বা হোক মহামারীতে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনাকারী কয়েকটি সংগঠন নিম্নে উল্লেখ করা হলো, যা সাধারণত সরাসরি দরবার থেকে বা দরবারের বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে।

১. মাইজভাণ্ডার দরবারের শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)
২. আনজুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া)।
৩. সাতগাছিয়া দরবারের AAGS Trust.
৪. দরবারে সিরিকোট'র আনজুমান -এ রাহমানিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট (Anjuman Trust)
৫. গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ।
৬. বায়তুশ শরফ দরবারের "বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ"।
৭. ঔষখাইন দরবারের "আশেকানে পাক পাঞ্জেতন রজা নূরিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট"।

---

[71] শেখ সাদী, বুস্তান, প্রথম অধ্যায়, আদল ওয়া তাদবির অংশে। [ফার্সি ভাষা]

[72] The Rehla of Ibn Battuta: Translated by Mahdi Husain, Baroda, 1976, 239

৮. আল আমিন বারিয়া দরবার শরীফের "তোহফা ফর ম্যানকাইন্ড"।

৩.৩ রাজনীতিতে সুফি-প্রভাব

বিভিন্ন সময়ে জরুরতের ভিত্তিতে ইনসাফের প্রশ্নে সুফিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম করলেও তাঁরা সাধারণত সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করেননি। বরং রুহানিয়াতের মাধ্যমে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাদের দর্শন ছিল– খিদমত-এ খালক, সুলহ-এ-কুল (সকলের জন্য শান্তি), ইনসাফ, ধর্মীয় সহনশীলতা। তাঁরা সুলতান-বাদশাহদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন, শাসকদের সতর্ক করতেন এবং জনগণের মধ্যে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রসার ঘটিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় গুরুত্বারোপ করতেন। বাংলার রাজনীতিতে সুফিদের ভূমিকা দুই ধরনের– এক. ঐতিহাসিকভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ গঠন করা, দুই. আধুনিককালে পীর-মুরিদি সম্পর্কের মাধ্যমে মধ্যপন্থী রাজনীতিতে প্রভাব তৈরি করা।

বাংলা সালতানাত (১২০৪-১৫৭৬ খ্রি.) এর ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল সুফি-সাধকদের মাধ্যমে। এই সময়ে সুফিরা সংগ্রাম ও সামরিক বিজয়ের পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করে শাসনকে বৈধতা দিয়েছেন। তাঁদের সংগ্রামী ইতিহাসের মধ্যে বগুড়ায় রাজা পরশুরামের বিরুদ্ধে শাহ সুলতান বলখি[73], ঢাকার বিক্রমপুরে রাজা বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে বাবা আদম শহীদ[74], রাজশাহীতে দেওরাজদের বিরুদ্ধে শাহ তুরকান[75] ও শাহ মখদুম রূপোশ[76], পশ্চিমবঙ্গে রাজা বিক্রম কেশরির বিরুদ্ধে শাহ মাখদুম গজনভী[77], সিলেটে রাজা গৌড়গৌবিন্দের বিরুদ্ধে শাহ জালাল ইয়ামেনি[78]সহ প্রমুখ সুফি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে, শহর-বন্দরের বিভিন্ন এলাকায় আরকানি ও মগদের বিরুদ্ধে কদল খাঁ গাজী ও তার সঙ্গী বারো আউলিয়া,[79] চকরিয়ায় বীর কামাল'র বিরুদ্ধে শাহ ওমর[80] অন্যতম। তাঁদের এই সংগ্রামের সিলসিলা মোগল আমলে পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে বুজুর্গ ওমেদ খাঁ, ব্রিটিশ আমলে মিরসরাইয়ের সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী,[81] দক্ষিণাঞ্চলে মাওলানা আবদুল হাকিম সিদ্দিকী[82], মাওলানা বজলুর রহমান সিদ্দিকী[83], পাকিস্তান আমলে মাইজভাণ্ডার দরবারের ভক্তবৃন্দ, কাদেরিয়া তরিকার মুরিদদের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত জারি ছিল। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবারে হযরত দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, সাতকানিয়ায় গারাংগিয়ায় হযরত আবদুর রশীদ হামেদী সিদ্দিকী, বায়তুশ শরফের মাওলানা আবদুল জব্বার শাহ ও দরবারে সিরিকোট'র সৈয়দ তৈয়ব শাহের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণনা অনুসারে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে দুইবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গমন করেন। ১৯৫৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর এক সাক্ষাতে দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সংগ্রাম পরিচালনা করার পরামর্শ দেন।[84] এই পাঁচটি মূলনীতিই কালক্রমে ৬৬'র ছয় দফা ও ৬৯'র নয় দফায় পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ও পতাকা উত্তোলন করে ওরসের আয়োজন করা হয়।

---

[73] বাংলাদেশের ইসলাম: আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৭৯

[74] তালিব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭

[75] হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ) এর জীবনেতিহাস। মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৫৩-৮

[76] রাজশাহীতে ইসলাম: ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৭

[77] মুহম্মাদ এনামুল হক রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৮৩-৮৮ (A History of Sufism in Bengal)

[78] মুহম্মাদ এনামুল হক রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত

[79] ওহিদুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, বইঘর, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২৪

[80] ড শেহাবুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪-৭২

[81] ওহিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১-৫৪

[82] মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া, সীরাতে সূফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ), ২০২২, পৃষ্ঠা ১৫৯-৬৪

[83] হামিদুল্লাহ খান, আহাদিসুল খাওয়ানিন, কলকাতা, ১৮৩১, পৃষ্ঠা ৩১৮

[84] মোঃ মাহবুব উল আলম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৩

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশের সুফি-সাধকরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। সেই থেকে এই যাবৎকাল পর্যন্ত তারা পীর-মুরিদি কার্যক্রমকে মুখ্য করে 'অরাজনৈতিক নাগরিক' হিসেবে জীবনযাপন করছে। সুফিদের প্রধান সামাজিক শক্তি হলো, পীর-মুরিদ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে হাল আমলের সুফিরা সাধারণত অরাজনৈতিক, অসামরিক ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। হাল আমলের রাজনীতিতে এই বিশাল জনগোষ্ঠী 'ভোট ব্যাংক' হিসেবেই কাজ করে থাকে, যা দেশের বিভিন্ন মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে সুফিবাদী জনগোষ্ঠীর ছোট ছোট অংশ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য কাজ করছেন। চরমপন্থা, উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সহনশীলতা-সহাবস্থান কায়েম করে জাতি-সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনাই তাঁদের লক্ষ্য বলে মনে হয়।

৩.৪ সাহিত্যে সুফি-প্রভাব

সুফিরা আধ্যাত্মিক প্রেম (ইশক-ই-এলাহি), আত্মশুদ্ধি, পরম সত্যের দ্বার উন্মোচন, পরমাত্মার সান্নিধ্য প্রকাশের জন্য গান ও সাহিত্যকে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাসাউফের জটিল সব দর্শনকে সাধারণের ভাষায় পৌঁছে দিয়ে ইসলামকে সহজ ও জনপ্রিয় করেছেন। সা'মা, কাওয়ালি, কবিতা, না'তে রাসুল, মানকাবাত, পুঁথি, মুর্শিদি/ গান রচনার মাধ্যমে তাঁরা ছড়িয়েছেন প্রেম, সমতা, মানবতা ও সহনশীলতার বাণী। চট্টগ্রামের মাটি ও চট্টগ্রামের জনগণ তাঁর জীবন্ত সাক্ষী এবং এখানকার দরবারসমূহ তাঁর জীবন্ত উদাহরণ। চট্টগ্রামের অলিগলি, দোকান, হোটেল বা কোনো প্যান্ডেল থেকে এখনো হরহামেশা না'ত, গান, গজল, মানকাবাত পাঠ শোনা যায়। বাজতে শোনা যায়– মাইজভাণ্ডারী ঘরানার গান: কবিয়াল রমেশ শীলের "দয়াল ভাণ্ডারী মোরে ত্বরায়ে নিও - চরম দিনে পরম বন্ধুর চরণ দেখাইও" বা বজলুর রহমান মন্দাকিনীর "কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়া হরিলে আমার প্রাণ - ছলনা কৌশলে, জগৎ মজালে, এমন মোহিনী জান"। কাদেরি ঘরানার গজল: আখতার আল কাদেরীর "অলি দিগের রাজা মহারাজ, লও মোদের সালাম খানি, আবদুল কাদের জিলানী" বা হাসান মুরাদের "গোলাপ নিলাম গাঁদা নিলাম, নিলাম রজনী গন্ধা - মনের সুখে মালা গেঁথেছি, সকাল থেকে সন্ধ্যা। চিশতিয়া ঘরানার সেমা: ওসখাইনের আলী রজা কানু শাহের লিখিত "একবার নয়ন ভরিয়া রূপ দেখরে শ্যাম বলরে" বা শাহিন শাহ শরফাতুল্লাহ মিয়ার "মন চল যাই গুরু ভজি, এই জগ মজা ঠগ, দেখ ভোজের বাজি"। এই ধরনের বিচিত্র বিষয়ের বহুবিধ গান চট্টগ্রামে জনপ্রিয়। সবই চট্টগ্রামের সুফি সাধকের রচিত গান। এ-সকল রচনা আঞ্চলিক সীমানা জয় করে সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও। চিশতিয়া তরিকা ও মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার দরবারগুলোতে এখনো প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সা'মা ও কাওয়ালী অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাইজভাণ্ডারের গানের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। এর রচিয়তাদের মধ্যে রমেশ শীল (৮টি গ্রন্থ ও ৩৫০+ গানের রচয়িতা), আবদুল গফুর হালী (২ হাজারের অধিক গানের রচয়িতা), আবদুল হাদি কাঞ্চনপুরী (১০০ গানের রচয়িতা), মনমোহন দত্ত (প্রায় ১ হাজার গানের রচয়িতা), আবদুল জব্বার শাহ মিমনগরী, বজলুল করিম মন্দাকিনী, মাহাবুব উল আলম, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল গনি, মাওলানা সৈয়দ আব্দুস সালাম ভুজপুরী, শাহজাদা সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী, মাওলানা আব্দুল লতিফ শাহ চন্দনাইশী, মাওলানা আব্দুল মালেক শাহ কাঞ্চনপুরী, মাওলানা আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরী, আমিনুল হক ধর্মপুরী অন্যতম। এভাবে শতাধিক লেখক মিলে লিখেছেন দশ হাজারের অধিক গান। এখনো অনেক গান রয়েছে, যা সেমা, কাওয়ালিতে গাওয়া হলেও সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থিত হয়নি।[85]

এভাবে ঔসখাইন দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আলি রজা কানু শাহ তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৭০০'র অধিক ভাবমূলক, ভক্তিমূলক, বন্দনামূলক ও তত্ত্বমূলক মারফতী গান রচনা করেন। যা এখন ১৭টি কাব্য গ্রন্থে মলাটবদ্ধ রয়েছে, এই রচনায় প্রায় ১২

[85] ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, মাইজভান্ডারী গান ও মানবকর্ম, *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৫।

ধরনের কাব্য পরিচয় যায়। মীর্জাখীল দরবারের ফখরুল আরেফীন আবদুল হাই জাহাঁগিরি ফতোয়া, ব্যাকরণ, ইসলামী নানা বিষয়াদিতে প্রায় দুইশতের অধিক কিতাব ও রেসালা প্রণয়ন করেন। অন্যদিকে, হযরত দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সুফি দর্শন, মাইজভাণ্ডারী দর্শন নিয়ে ১০টি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। নিজেদের রচনার পাশাপাশি বাংলা ও ধর্মীয় সাহিত্যেও সুফিদের প্রভাব বিদ্যমান। সুফি ঘরানার গান ও সাহিত্যের বাইরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামের সুফিদের এমন অনেক রচনা রয়েছে, যা দরবার বা বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত থাকলেও এখনো পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি।

৩.৫ শিক্ষায় সুফি-প্রভাব

সুফি দর্শন অনুসারে, ইলম (জ্ঞান) দুই ধরনের। এক. ইলমে জাহের (বাহ্যিক বা শরিয়তি জ্ঞান) দুই. ইলমে বাতেন (অভ্যন্তরীণ বা মারেফতি জ্ঞান)। একজন সুফি সাধকের জন্য দুই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। এই দুইয়ের সমন্বয়ে একজন সুফি লাভ করেন ইলমে হাকিকত (পরম সত্যের লাভের জ্ঞান)। অতীতের সাধকরা এ সকল জ্ঞানার্জন করতেন কোনো একজন বিজ্ঞ, পরমাত্মার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সুফি থেকে। আর সুফিদের খানকাহই ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ের 'বিশ্ববিদ্যালয়'। যেখানে শরিয়ত, তাসাউফ, কুরআন-হাদিস, সাহিত্য, দর্শন এমনকি স্থানীয় বিজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হতো। দরসগাহ/খানকায় সাধারণ মানুষ, নিম্নবর্গ ও নারীদের জন্যও শিক্ষা উন্মুক্ত ছিল। এভাবে সুফিরা বাংলায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজও বাংলাদেশের সুফি তরিকাগুলো আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে জ্ঞানার্জন ও পাঠদানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অতীতের পুরোটা সময় সুফিরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পাঠদান করলেও ব্রিটিশ আমলের শেষদিক থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। চট্টগ্রামে হযরত শাহ চান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯২৮ খ্রি.) জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৫৪ খ্রি.), আল আমিন বারিয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯৬৮ খ্রি.), বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্রাসা (১৯৮২ খ্রি), মীরসরাই লতিফীয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯৮৪ খ্রি.) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে দরবার/ খানকা কর্তৃক পরিচালিত কিছু ট্রাস্ট/আনজুমান/ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থায় রীতিমতো বিপ্লব সংঘটিত করে। উদাহরণস্বরূপ: ১৯২৫ সালে সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের অধীনে সারাদেশে শতাধিক মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া আনজুমানের অধীনে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণা কেন্দ্র ও প্রকাশনা পরিচালিত হয় এবং 'মাসিক তরজুমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে বায়তুশ শরফ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সুফি মীর মোহাম্মদ আখতার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তাহাদে বাংলাদেশ" ১৯২৫ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আনজুমানের অধীনে ১৮৫টি মসজিদ, ৩৬টি মাদ্রাসা, ৬২টি এতিম ও হিফজখানা, ৮টি পাঠাগার ও ৪টি স্কুল পরিচালিত হয়। এর অধীনে ৩টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হয় এবং 'মাসিক দ্বীন দুনিয়া', 'কিশোর দ্বীন দুনিয়া' ও 'খাতুনে জান্নাত' নামে ৩টি মাসিক সংবাদপত্র ও 'মাজাল্লাতু আয্ যিকির ওয়াল ফিকর' নামে জার্নাল প্রকাশ হয়ে থাকে। আরেকটি হলো, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পুত্র সৈয়দ হাসান মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট" যা ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই ট্রাস্টের অধীনে ৩১টি স্কুল ও মাদ্রাসায় চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এবং ৫টি এতিমখানায় দুইশত এতিম অধ্যয়নরত রয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত ১৩৫টি পিছিয়ে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ৯৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৫৭ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান, দক্ষতা উন্নয়নের ৩০০ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে কারিগরি বৃত্তি এবং এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এসব ট্রাস্ট ছাড়াও দরবারসমূহ কর্তৃক পরিচালিত আনজুমান/সংগঠন এর মাধ্যমে এ খাতে সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের সুফি-দরগাহ সমূহের অন্যতম

একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রায় প্রত্যেক দরবার/দরগাহর পাশে অন্তত একটি করে মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা থাকা, যা দরবার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৩.৬ সংস্কৃতিতে সুফি-প্রভাব

সুফিরা ইসলামকে কঠোর শরিয়তী অনুসরণের বিপরীতে প্রেম, সহনশীলতা, লোকাচারের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিকে দিয়েছেন এক অনন্য মাত্রা। ফলে বাংলার কৃষ্টি-কালচার অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর সহনশীল, মিশ্র ও জীবন্ত। এখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ঐতিহ্য একসাথে মিলেমিশে আছে। স্থাপত্য, উৎসব, লোকশিল্প, খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন রীতিনীতিতে সুফি-ছাপ স্পষ্ট। চট্টগ্রামে এর প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট ও জীবন্ত। এই অঞ্চলে সুফিরা মসজিদ-দরগাহকে স্রেফ ইবাদতের আঁতুড়ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেননি। বরঞ্চ এসবকে গড়ে তুলেছেন সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। যেমন: মাইজভাণ্ডার দরবার ও মাইজভাণ্ডারীয়া সিলসিলাভুক্ত দরবারসমূহে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত কাওয়ালী, চিশতিয়া তরিকাভুক্ত ওসখাইন ও দক্ষিণ শুকছড়ি দরবারে অনুষ্ঠিত সেমা মাহফিল, কাদেরিয়া তরিকার দরবারসমূহের নাত মাহফিল বা সাপ্তাহিক জলসা, মহররম মাসে দরবারসমূহে আশুরা পালন, রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবী, রবিউল সানি মাসে বড়পীরের স্মরণে ফাতেহা-এ ইয়াজদাহম ও শিরনি বিতরণ, রমজানে মাসব্যাপী ইফতারের আয়োজন, লঙ্গরখানা, বার্ষিক ওরস শরিফ ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান তাঁর উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

সুফি-উৎসবকে বলা হয় বাংলার সংস্কৃতির প্রাণ। এই উৎসবমালা একসাথে ধর্মীয় কার্যক্রম পালনের পাশাপাশি সামাজিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। চট্টগ্রামে সাধারণত প্রতিটি দরবার/দরগাহ-এ প্রতিবছর দরবারের প্রতিষ্ঠাতা সুফি ও অন্যান্য মরহুম সুফি-সাধকদের খোজরোশ শরীফ (জন্মবার্ষিকী) ও ওরস শরিফ (ওফাত দিবস) উদযাপিত হয়। যেমন: মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে ৮-১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর ওরস শরিফ, ২২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর ওরস শরিফ, ২৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ওরস শরিফ প্রায় ৫-১০ লক্ষ ভক্ত মুরিদানদের উপস্থিতিতে মহসমারোহে পালন করা হয়। চট্টগ্রামের বাইরে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল, রংপুর এবং দিনাজপুর থেকে লোকজন বাস, মাইক্রোবাস এবং সিএনজিতে আসে, এবং বিদেশ থেকে (যেমন আমেরিকা এবং ইউরোপ) ভক্তদের আগমন ঘটে। প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার শত শত লোক মাজার জিয়ারত করে, এবং শবে-বরাত ও শবে-কদরে ১০-১৫ হাজার লোক জড়ো হয়। একইভাবে কুতুবদিয়ার হযরত শাহ আবদুল মালেক এর দরবারে বার্ষিক ওরসে লক্ষাধিক লোক জড়ো হয়, এবং প্রতিদিন ১০০-২০০ লোক মাজার জিয়ারত করেন। সাতকানিয়ার মির্জাখীল দরবার শরীফের ওরসে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে, এবং প্রতিদিন ১৫০-২০০ লোক আসে। মহানগরে ধনিয়ালাপাড়ার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে প্রতিদিন ১০০ জনের বেশি লোক যাতায়াত করে, এবং শবে-বরাতে ৫০ হাজারের বেশি এবং শবে-কদরে ৩০ হাজারের বেশি লোক জমায়েত হয়। লোহাগাড়ার আকতরাবাদে বার্ষিক ইসালে ছওয়াব মাহফিলে ১ লক্ষের বেশি লোক আসে, এবং বড়পীরের ফাতেহা-এ ইয়াজদাহমে ৫০ হাজারের বেশি লোক জড়ো হয়।[86]

দরবারের ওরস শরিফ ছাড়াও আরেকটি বড় অনুষ্ঠান হলো- রবিউল আউয়াল মাসে জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবীর আয়োজন। দরবারের বর্তমান পীরের উপস্থিতিতে/সদারতে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন সকাল থেকেই এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে পীর সাহেবসহ সকল ভক্ত মুরিদান নবীজীর আগমনী বার্তা জানার দেওয়ার প্রতীকিস্বরূপ বিশাল র‍্যালির সাথে কয়েক মাইল হেঁটে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন। তারপর দরুদ পাঠ, মিলাদ-কিয়াম, নবীজীল জীবনীসহ সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা, মাঠে জোহর ও আসরের নামাজ আদায়, সবশেষে পীর সাহেবের মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। যেমন: প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল আলমগীর খানকা

[86] শিব প্রসাদ শূর, প্রাগুক্ত, ১৩৮-৪৮

শরীফে প্রায় ৮-১০ লক্ষ ভক্ত মুরিদানের উপস্থিতিতে জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) পালন করা হয়। ১৯৭৪ সালে দরবারের পীর আল্লামা সৈয়দ কারী তৈয়ব শাহ (র.) এর মাধ্যমে চট্টগ্রামে এই অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এটি শুরুতে বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকাহ-এ কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়া নামক স্থানে পালন করা হলেও তা বর্তমানে শহরের জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও একই দিনে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ধর্মপুর দরবার শরীফসহ অন্তত ৫০টি দরবারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। ১২ই রবিউল আউয়াল ছাড়াও ১-১২ই রবিউল আউয়ালের যে-কোনো দিনে এটি পালন করা যায়।[87]

উপরোক্ত প্রভাবসমূহ ছাড়াও এই অঞ্চলের মানুষের উপর অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, যুব উন্নয়ন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খাতে গভীরভাবে সুফি-সমাজ প্রভাব বিস্তার করেছে। যার দরুন বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সমাজই সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও কল্যাণমুখী।

৩.৭ পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রভাব নির্ণয়

২০০৯ সালে চন্দনাইশ উপজেলার বরমা কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শিব প্রসাদ শূর "সুফি জীবন দর্শন প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম"[88] নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে লেখক চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুফি দর্শন, তরিকা ও প্রভাব বর্ণনার পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের উপর সুফি-প্রভাব নিয়ে একটি মাঠ পর্যায়ের জরিপ ও গবেষণা উপস্থাপন করেন। এতে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৭টি গ্রামে মোট ১১০ জনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে নির্দিষ্ট একটি প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে এই জরিপ করেন। এই জরিপে দেখা যায়, চট্টগ্রামের জনসংখ্যার (প্রায় ৬৬ লক্ষ) ৬৯% সুফিদের দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ: চট্টগ্রাম উত্তরের কাঞ্চননগরে ২৫% প্রত্যক্ষ ও ৫০% পরোক্ষ; নানুপুরে ১৫% প্রত্যক্ষ ও ৫০% পরোক্ষ; মাইজভাণ্ডারে ২% প্রত্যক্ষ ও ৫৫% পরোক্ষ; এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণে বারখাইনে ৪০% প্রত্যক্ষ ও ২০% পরোক্ষ; গারাঙ্গীয়ায় ২৮% প্রত্যক্ষ ও ৬৬% পরোক্ষ; হাশিমপুরে ৫% প্রত্যক্ষ ও ৬৭% পরোক্ষ; তৈলারদ্বীপে ২৮% প্রত্যক্ষ ও ৬৬% পরোক্ষভাবে সুফিদের দ্বারা প্রভাবিত।

কোন তরিকার কেমন প্রভাব তা নিয়ে লেখক শিব প্রসাদ শূর বলেন, মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার প্রাধান্য বেশিরভাগ উত্তর চট্টগ্রাম, তবে শহরাঞ্চলেও এর অনুসারী রয়েছে। অন্যদিকে লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, কুতুবদিয়া, কদম তলী, আগ্রাবাদ, বেপারিপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে মোজাদ্দেদিয়া তরিকা ও শরিয়তের প্রাধান্য বেশি। তবে চ্যালেঞ্জস্বরূপ তিনি দেখান, মাইজভাণ্ডার গ্রামে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০% ওহাবী মতাদর্শী । তারা পীর প্রথা এবং মাজার প্রথার সরাসরি বিরোধী। আর ৭০% জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুফিদের দ্বারা প্রভাবিত। সর্বোপরি, তিনি চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুফিদের দরবার ও মাজারে আসা ব্যাক্তিদের সংখ্যা পর্যালোচনা করে বলেন, "চট্টগ্রামের অধিবাসী ও চট্টগ্রামের বাইরের অঞ্চলেরও অন্তত ১ থেকে ১.৫ কোটি মানুষের উপর সুফিদের প্রভাব বিদ্যমান।" গ্রন্থের শেষে লেখক জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা এবং ৬৯ জন ব্যক্তির উত্তর ও অভিমত উপস্থাপন করেন।[89] উল্লেখ্য যে, এটি ২০০৯ সালে সংঘটিত অতিসংক্ষিপ্ত একটি জরিপ। হাল-আমলের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় হতে পারে না। কিন্তু এই জরিপটির মাধ্যমে এক যুগ আগে চট্টগ্রামের জনমানস ও অঞ্চলভেদে সুফি-সমাজের প্রভাব কেমন ছিল তার একটি বাস্তবভিত্তিক ধারণা পাওয়া যায়।

---

[87] সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনে এর বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান।

[88] শিব প্রসাদ শূর, প্রাগুক্ত, ১৬২-১৭১.

[89] প্রাগুক্ত, ১৮২-২১৬

উপসংহার: চট্টগ্রামের সুফি-সমাজে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার চর্চাই সর্বাধিক। মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকায় কাদেরিয়া তরিকার পাশাপাশি চিশতীয়া তরিকার সংযুক্তিও রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম, দরবারে সিরিকোট কাদেরিয়া তরিকার দরবার। ফলত, প্রধান চার তরিকার দিক থেকে চট্টগ্রামে কাদেরিয়া তরিকার চর্চা, বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তাই এককভাবে শীর্ষে। তারপরেই রয়েছে নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অবস্থান। চিশতীয়া তরিকারও চর্চা রয়েছে একাধিক দরবারে। প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি তরিকারই স্বতন্ত্র সাধনপদ্ধতি রয়েছে; এই মোতাবেক অনুসারীদের অজিফা প্রদান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই চট্টগ্রামের সুফি-সমাজে বিদ্যমান সকল তরিকা একযোগে ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিসরে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এতে তরিকার আভ্যন্তরীণ সুফি-সাধনার পাশাপাশি বহির্মুখী কল্যাণকামী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে সুফি-সাধনার সৌহার্দ্য, সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে পারস্পরিক মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব এমন ভয়াবহ সহিংসতায় পরিণত হয়েছে যা বাংলাদেশের চিরায়ত সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের জন্যও আশঙ্কাজনক ও হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায়, ঐতিহাসিকভাবে বাংলার সুফি-সমাজ যে সম্প্রীতি, শুভেচ্ছা ও মমতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছিলেন ও বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছেন সেই আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির কাছে আশ্রয় নেয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ফলত, চট্টগ্রামের সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিশেষত বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য ঐতিহাসিক সুফি-ব্যক্তিত্বদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বর্তমান সুফি-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণকামী কার্যক্রম চলমান রাখাই অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশের ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪।

২. এ. এম. খলীলুর রহমান, *সূফীবাদ ও চারি তরীকার পীর*, বগুড়া, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮০।

৩. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সূফি দর্শন*, ঢাকা, ২০০২।

৪. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ঢাকা, ২০১৯।

৫. ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০।

৬. ড. আব্দুল করিম, *বাংলাদেশের সুফি সম্প্রদায় ও তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা*, ঢাকা, আগস্ট ১৯৬৯।

৭. ড. মনির-উদ্দীন ইউসুফ, *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব*, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, ঢাকা, আগস্ট ১৯৬৯।

৮. ড. মো. বদিউর রহমান, *মুসলিম দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, ২০০৫।

৯. ড. মো. বদিউর রহমান, *হযরত ইমাম হাসান আল বসরী*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।

১০. জামাল উদ্দিন, *পীর আউলিয়ার পুন্যভূমি চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ২০১৮।

১১. রশীদ আহমদ, *বাংলাদেশের সূফীসাধক*, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪।

১২. শিব প্রসাদ শূর, *সূফী জীবন দর্শন প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ২০১০।

১৩. শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র:), *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, অনুবাদ: মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা, মার্চ ২০০৩।

১৪. হামিদুল্লাহ খান, *আহাদিসুল খাওয়ানিন*, কলকাতা, ১৮৩১।

১৫. মোঃ মাহবুব উল আলম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভান্ডার দরবার শরীফ*, চট্টগ্রাম, আলোরধারা বুকস, ২০১৪।

১৬. Saiyed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982।

১৭. Saiyid Athar Abbas Rizvi, *A History of Sufism in India*, vol. 1, New Delhi, 1986।

১৮. Shahabuddin Suhrawardi, *A Dervish Textbook from the 'Awariful-Ma'rifa, Translated from Persian into English* by Lieut. Col. H. Wilberforce-Clarke, The Octagon Press, London, 1990।